কমিউনিস্ট পার্টি
মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী
বাংলাদেশ
এর
ঘোষণা ও কর্মসূচি

কেন্দ্রীয় কমিটি
কমিউনিস্ট পার্টি
মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী
বাংলাদেশ
কর্তৃক ১মে ২০১২ প্রকাশিত ।

সূচনা

মহান মার্কস ও এঙ্গেলস যে দিশা মানব জাতিকে দিয়েছেন তা হচ্ছে কমিউনিজমের দিশা । মার্কসবাদের মধ্যে মূর্ত এই মতবাদকে মহামতি লেনিন বলেন সর্বশক্তিমান, কারণ তা সত্য । আজকের যে শোষণমূলক সমাজে আমরা বাস করছি তা একসময় অস্তিত্বমান ছিলনা । আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোন শোষণ ছিলনা । নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ছিল সমান । যৌথভাবে সবাই কাজ করতো আর কাজের ফল সমভাবে তা সবার মধ্যে বন্টিত হতো । পরবর্তীতে যখন মুষ্টিমেয় কিছু লোক যারা ছিল গোত্রপতি, বিভিন্ন সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতিপত্তি ও সম্পদের মালিকানা অর্জন করে ব্যাপক অধিকাংশ মানুষকে দাস বানিয়ে ফেলল তখন থেকেই শ্রেণী সমাজের উদ্ভব ঘটলো । শোষণের এ ধারা বজায় থাকে দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ ও বর্তমান পুঁজিবাদী স্তরে । কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সর্বপ্রথম দেখান যে সমাজের শোষিত শ্রেণী সর্বহারা শ্রেনী এই পুঁজিবাদী সমাজকে ভেঙে ফেলবে আর গড়ে তুলবে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজ । মহান লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় পুঁজিবাদী সমাজকে উৎখাতের মাধ্যমে গড়ে ওঠে প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজ । স্তালিনের নেতৃত্বে এ সমাজ সংগ্রাম করে টিকে থাকে । মাওয়ের নেতৃত্বে চীনে সামন্তবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাতের মাধ্যমে নয়াগণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের ধারা সূচিত হয় ।

এই মহান আদর্শিক সংগ্রাম শুরু হয়ে হয়েছিল ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও!’ ঘোষণা করার সাথে সাথে, তারপর মানব জাতি প্রত্যক্ষ করেছে অপরিমেয় আত্মদান ও মহান সংগ্রামসমূহ । ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউন, ১৯১৭ সালে রুশ বিপব, ১৯৪৯ সালে চীন বিপব আর ১৯৬৬-১৯৭৬ সালের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপব ছিল সর্বহারা নেতৃত্বে এই লক্ষ্যে মহান সব বিপ-বসমূহ । তারপর পেরু, নেপাল, বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিপাইন, তুরস্কসহ সারা দুনিয়ায় গণযুদ্ধের নতুনসব উত্থানসমূহ আজকে বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে সেই লক্ষ্যের দিকে । কমিউনিজমের মতবাদ মার্কস-এঙ্গেলস কর্তৃক মার্কসবাদে. লেনিন-স্তালিন কর্তৃক লেনিনবাদে আর মাও-চারু মজুমদার-সিরাজ সিকদার-গনসালো-ইব্রাহীম কাপাক্কায়া প্রমুখ কর্তৃক মাওবাদে রূপ নিয়েছে । আজকে এই মতবাদ অব্যাহতভাবেই বিকশিত হয়ে চলেছে ।

আজকের বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটি প্রাচীন কালে ছিল এক সমৃদ্ধশালী দেশ । এখানে ছিল জনজাতিসমূহের বাস যারা আমাদের দেশের বাঙালী ও অপরাপর ক্ষুদ্র জাতিসমূহের পূর্বপুরুষ । এখানে প্রাচীন কালেই নগররাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল ধারণা করা যায় । বিদেশী রাজশক্তিসমূহ একের

পর এক এদেশকে দখল করেছে, এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে কখনও হিন্দু কখনো বৌদ্ধ কখনো ইসলামের নামে। এখানে জাত পাত, সাম্প্রদায়িকতাসহ বিভিন্ন রূপের শোষণের কাঠামো তৈরি করেছে ভুমিদাসত্বের ভিত্তিতে। জনগণ উপর থেকে আরোপিত ধর্মীয় নিপীড়ণের মোড়কে আসা বৈষম্য অন্যায় অত্যাচার থেকে বাঁচতে বারংবার ধর্ম পরিবর্তন করেছে, কিন্তু এ নিপীড়ণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম রাজ রাজরারা এদেশে এসে এদেশীয় নাম ধারন করেছে, কিন্তু পরবর্তীতে আঠারো শতকে যে ইংরেজরা এদেশে উপনিবেশ কায়েম করে তারা এদেশীয় হতে আসেনি। ধর্মও তাদের কাছে ছিল কম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরা পুঁজিবাদের প্রতিনিধি। তারা এদেশের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, এদেশের সমৃদ্ধ শিল্প ধ্বংস করেছে, এদেশের কাঁচামাল থেকে ইংল্যান্ডে শিল্প গড়ে তুলেছে। তারা এদেশের কৃষি উৎপাদ লুণ্ঠন করে দুটি মহা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে বাঙালী জাতিকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। এদেশের কৃষকরা বিরাটাকারে বিদ্রোহে ফেঁটে পড়েছেন। ফকির-সন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, তেভাগাসহ অজস্র বিদ্রোহে কৃষকরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছেন। রুশ বিপবের পর ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে, কিন্তু এই পার্টি কৃষকদেরকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ও তাদের ভিত্তি সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে চালিত করেনা, তাদের সশস্ত্র সংগ্রামকে নেতৃত্ব দিতে অস্বীকৃতি জানায়। উপরন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদ সংক্রান্ত কমিন্টার্নের যুক্তফ্রন্টের লাইনের নামে ব্রিটিশের সাথে ঐক্যের পথে ভারতবাসীকে চালিত করার চেষ্টা করে, ফলে সাম্প্রদায়িক শ্রেণীদ্বন্দ্বকে বৈরি দ্বন্দ্বে পরিণত করে ভারতের হিন্দু ও মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তদের প্রতিনিধি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ট কৃষক জনগণ মুসলিম ধর্মাবলম্বী হিসেবে হিন্দু জমিদারদের কর্তৃক সাম্প্রদায়িক শোষণ ও নিপীড়ণের শিকার ছিল, তাই বিপবের মাধ্যমে সমাধান না হওয়ায় পূর্ববাংলার মুসলিম কৃষকরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়। পাকিস্তানের উদ্ভবের পর থেকেই অনগ্রসর পূর্ববাংলা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়। পূর্ববাংলা থেকে হিন্দু জমিদাররা চলে গেলে সেসব জমি এখানকার মুসলিম ধনীদের হস্তগত হয়। ভূমি সমস্যা থেকে যায় অসমাধিত। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণ জেগে ওঠেন ১৯৫২র ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ আন্দোলন থেকে ৭১-এর জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের সংগ্রামসমূহকে সঠিক লাইনে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদ আবির্ভূত হলে উক্ত পার্টি সংশোধনবাদী পার্টিতে পরিণত হয়। এর বিরুদ্ধে চেয়ারম্যানের মাওয়ের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সংগ্রাম সূচিত হলে ঐ পার্টি মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়। পিকিংপন্থী ধারাটি সংশোধনবাদ থেকে মুক্ত হতে পারেনা। সংশোধনবাদের এই শেকলকে ভেঙে ফেলেন কমরেড সিরাজ সিকদার।

সিরাজ সিকদার হচ্ছেন বাংলাদেশের মহানতম সন্তান যিনি এখানে সর্বহারা শ্রেণীকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশ হিসেবে মাও চিন্তাধারাকে হাতে তুলে নিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই ভিত্তিতে তিনি সঠিকভাবে পূর্ববাংলার সমাজকে ঔপনিবেশিক-আধা সামন্তবাদী হিসেবে বিশেষণ করেন এবং সর্বহারা শ্রেণীকে নেতৃত্ব দেন তাঁর নিজ পার্টি গড়ে তুলতে, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাঁর বাহিনী গড়ে তোলায়, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমাবেশিত করার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট গঠনে, ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ গড়ে তোলায়। তিনি সর্বহারা শ্রেণীকে জাতীয় ও শ্রেণীর মুক্তির লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। সভাপতি সিরাজ সিকদার এদেশে গণযুদ্ধ সুচিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৭১-এ বাঙালী উঠতি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ও সামন্তদের দল আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানকে হটিয়ে পূর্ববাংলা দখল করতে সক্ষম হয়। মার্কিনের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদের মদদপ্রাপ্ত পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণের আবির্ভাব ঘটে যার পেছনে ছিল সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। ১৯৭৫-এ মার্কিনের দালাল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানে ভারতের দালাল শেখ মুজিবের সরকারের পতন ঘটে। তারপর জিয়ার সামরিক আমলাদের শাসন এবং আরেকটি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া দল বিএনপি গঠিত হয়। এরা তথাকথিত নির্বাচিত সরকার কায়েম করে। ৮২-তে এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর হাতে বিএনপির সরকারের পতন ঘটে। তারপর আট বছর এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক শাসন চলে। ৯০-এ মধ্যবিত্ত গণআন্দোলনে এরশাদের পতন হলে পুনরায় বেসামরিক বুর্জোয়াদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। খালেদার নেতৃত্বে দুইবার এবং হাসিনার নেতৃত্বে দুই দফার সরকারের মধ্যে একবার তত্ত্বাবধায়ক সামরিক সরকার ২০০৭-৮-এ দুই বছরের মতো ক্ষমতাসীন ছিল। ১৯৭৫-এ সিরাজ সিকদার শহীদ হওয়ার পর পার্টি এক গুরুতর সংকটে পতিত হয়। তারপর পার্টির মাওপন্থী অংশের নেতৃত্ব দেন আনোয়ার কবীর। হোজাপন্থী জিয়াউদ্দিনের ক্রমিক অধঃপতন ও বিলোপ ঘটে। আশির দশকে আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে ওঠে তাকে গণযুদ্ধ বলা যায়না। এটা ছিল এক সমন্বয়বাদ। একদিকে সভাপতি সিরাজ সিকদার লাইন অপরদিকে তার নিজ লাইনের মধ্যে তিনি এক সমন্বয় ঘটান। এই সমন্বয়বাদের ফল হিসেবে ৩য় কংগ্রেসে আনোয়ার কবীর ও তার সঙ্গীদের নেতৃত্বে সভাপতি সিরাজ সিকদারের লাইনকে বর্জনের মাধ্যমে পার্টি ধ্বংসের লাইন পাশ হয়। নব্বই দশকে সিরাজ সিকদারের গড়া পূবাসপা মূলতঃ ধ্বংস হয়েছে। ২০০৪ সালে পূবাসপার কিছু নবীন কর্মীদের নিয়ে মাওবাদী একতা গ্রুপ গঠিত হয় যা ছিল পার্টি ও এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনর্গঠনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। কিন্তু ইতিমধ্যেই পার্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে দীর্ঘ কয়েক যুগের সংস্কারবাদী ও সংশোধনবাদী লাইন অনুশীলনের ফলশ্রুতিতে। সংশোধনবাদী নেতারা সভাপতি সিরাজ সিকদার ও পূবাসপাকে পরিণত করেছে এক ইতিহাসের বিষয়ে। আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে এক ভিন্ন পূবাসপা--যার মধ্যে লেশমাত্রও সিরাজ সিকদারের মতাদর্শ নেই বরং এক সংশোধনবাদী মতাদর্শ। সুতরাং এই সংশোধনবাদী মতাদর্শই অনুশীলিত হয়েছে গোটা নব্বই দশক ও একুশ শতকের শুরুতে। সুতরাং এমইউজির পক্ষে পূবাসপার ঐ অংশটির পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়নি। মাওবাদী একতা গ্রুপ মতাদর্শিক ক্ষেত্রে কাজ করেছে, বাস্তব অনুশীলনে যেসব কাজ করেছে তা আমাদের দেশে এক নয়া মালেমা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রস্তুতিতে অবদান রেখেছে। আজকে এটা পরিষ্কার যে নতুন পার্টি গড়ে তুলতে হবে যা মালেমার সৃজনশীল বিকাশের উপর দাঁড়িয়ে একুশ শতকের বাস্তবতাকে ধারণ করবে। সেটা অতি অবশ্যই হবে সভাপতি সিরাজ সিকদার ও তাঁর নেতৃত্বাধীন পূবাসপার এক ধারাবাহিকতা, কিন্তু মধ্যবর্তী সময়কালের ভ্রান্ত ধারাবাহিকতাকে তা অবশ্যই বর্জন করবে। আজকে নতুনভাবে সবকিছু গড়ে তোলার সময়, অবশ্যই এক নতুন ভিত্তিতে।

মতাদর্শ

আমাদের মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ। এটা হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাতিক মতবাদ। এর বিকাশের দ্বান্দিক প্রক্রিয়ার রয়েছে তিনটি স্তর।

মার্কসবাদ

কার্ল মার্কস তাঁর ঘনিষ্ঠ কমরেড এঙ্গেলসের সহযোগিতায় এ মতবাদ বিকশিত করেন। মার্কস যে দর্শন বিকশিত করে তোলেন তা হচ্ছে দ্বান্দিক বস্তুবাদ। এই দ্বান্দিক বস্তুবাদই হচ্ছে প্রকৃতি, সমাজ ও মানব চিন্তাধারার বিকাশের নিয়ম। এই নিয়ম অনুযায়ী বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই রয়েছে বিপরীত দিকসমূহের মধ্যে সংগ্রাম ও ঐক্য । এই সংগ্রাম স্থায়ী কিন্তু ঐক্য হচ্ছে অস্থায়ী। এই সংগ্রামের কারণেই পুরাতনের বিলোপ ঘটে ও নতুনের আবির্ভাব ঘটে। মার্কস এক রাজনৈতিক অর্থনীতি বিকশিত করেন যা উদ্ঘাটিত করে দেয় শ্রেণীশোষণ। উদ্বৃত্ত মুল্য তত্ত্বের মাধ্যমে মার্কস দেখান যে মানুষের শ্রমশক্তি যে বাড়তি মূল্য উৎপাদন করে তা শোষণ করে কীভাবে পুঁজি স্ফীত হয়। পুঁজিবাদী সমাজের অর্ন্তনিহিত দ্বন্দ্ব তাঁরা আবিষ্কার করেন। তিনি ও এঙ্গেলস প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠণ করেন এবং কমিউনিস্ট ইশতেহারের মাধ্যমে ঘোষণা করেন---সারা দুনিয়ার সর্বহারা এক হও! ১৮৭১-এ প্যারি কমিউনে সর্বহারা শ্রেনী সর্বপ্রথম ক্ষমতা দখল করলে তাঁরা তার অভিজ্ঞতার সারসংকলন করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বহারা শ্রেণীকে তাঁর ঐতিহাসিক কর্তব্যের উপলব্ধি দ্বারা সজ্জিত করেন--আর তা হচ্ছে বিপবের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং এই ক্ষমতাকে অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বকে ব্যবহার করা। মার্কস সর্বহারা আন্দোলনের মধ্যকার সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম পরিচালনা করেন যারা মজুরি দাসত্বের উচ্ছেদের পরিবর্তে এর অবস্থার কিছু উন্নয়নের মাধ্যমে একে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। মার্কসের অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতিকে বলা হয় মার্কসবাদ, আর এটা হচ্ছে সর্বহারার মতাদর্শের বিকাশে প্রথম মাইলফলক।

লেনিনবাদ

রাশিয়ায় বিপবের প্রক্রিয়ায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় লেনিন মার্কসবাদকে সম্পূর্ন এক নতুন স্তরে উন্নীত করেন তা হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। লেনিন দেখান যে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উন্নীত হয়েছে যেখানে শিল্প পুঁজি ও বনিক পুঁজির মিলনের ফলে লগ্নি পুঁজির উদ্ভব ঘটেছে এবং পুঁজি রপ্তানীই এই পর্যায়ের প্রধান ধারা। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিবাদ আর এটা হচ্ছে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের গোষ্ঠিগুলি বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত আর এই বন্টন ও পুনর্বন্টনের সংঘাতে পর্যায়ক্রমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। লেনিন দেখান যে বর্তমান যুগ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপবের যুগ। গোটা বিশ্ব একদিকে সাম্রাজ্যবাদ অপরদিকে নিপীড়িত জাতিসমূহের মাঝে বিভক্ত হয়ে গেছে। এ থেকেই তিনি সর্বহারা বিপবের রণনীতি ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রণনীতির সম্মিলনের ধারণা তুলে ধরেন। লেনিন সর্বহারা শ্রেণীর এক নতুন ধরণের পার্টির ধারণা তুলে ধরেন যা হচ্ছে বিপবী জনগণের ক্ষমতা দখলে নেতৃত্ব দেওয়ার এক অপরিহার্য হাতিয়ার। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাশিয়ায় সর্বহারা শ্রেণীর বিজয়ী ক্ষমতা দখলে ও এর বিপবী একনায়কত্বের সুসংহতকরণে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়ায় লেনিন সর্বহারা বিপবের তত্ত্ব ও অনুশীলনকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করেন। লেনিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে জীবন মরণ সংগ্রাম পরিচালনা করেন যারা সর্বহারা বিপবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীকে নসিহত করেছিল নিজ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর স্বার্থের পক্ষে দাঁড়াতে। অক্টোবর বিপবের বিজয় এবং লেনিনের সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়, সারা দুনিয়ার নিপীড়িতদের আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং এভাবে তৃতিয় আন্তর্জাতিক অর্থাৎ কমিন্টার্ণ গঠিত হয়। সর্বহারা মতাদর্শে লেনিনের কৃত সার্বিক ও সামগ্রিক বিকাশ সর্বহারা মতাদর্শের বিকাশে দ্বিতীয় মহান মাইলফলককে প্রতিনিধিত্ব করে। লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিন আভ্যন্তরীণ শত্রুদের হাত থেকে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ফ্যাসিবাদী হানাদারদের হাত থেকে সর্বহারা একনায়কত্বকে রক্ষা করেন এবং সমাজতন্ত্রিক মতাদর্শ, গঠনকার্য ও রূপান্তরকে এগিয়ে নেন। সর্বহারা মতাদর্শের বিকাশে দ্বিতীয় মহান মাইলফলক হিসেবে লেনিনবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে স্তালিন সংগ্রাম চালান। লেনিনবাদের সূত্রায়ণ স্তালিনই করেছিলেন।

মাওবাদ

বহু যুগের চীনা গণতান্ত্রিক ও জাতীয় বিপব, সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংগ্রাম এবং সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপবের প্রক্রিয়ায় মাওসেতুঙ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে এক সম্পূর্ণ নতুন স্তরে উন্নীত করেন তা হচ্ছে মাওবাদের স্তর। মাও দেখিয়েছেন যে দ্বন্দ্ববাদের একমাত্র মৌলিক সূত্র হলো বিপরীতের একত্বের নিয়ম। পরিমাণের গুণে রূপান্তরকে তিনি এই বিপরীতের একত্বের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। আর বলেছেন নেতিকরণের নেতিকরণ নিয়ম হিসেবে বিরাজ করেনা। যা রয়েছে তা হচ্ছে ইতিকরণ ও নেতিকরণের বিপরীতের একত্ব। বিকাশের এতকাল ধরে চলে আসা ত্রয়ী মতবাদকে তিনি বাতিল করেছেন যা তিনটি সূত্রকে সমান গুরুত্বে পাশাপাশি উপস্থাপন করে, আর প্রতিষ্ঠা করেছেন অদ্বৈতবাদ। সুতরাং কমরেড মাওই মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদকে পুর্ণাঙ্গ ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি বহুমাত্রিকভাবে দ্বন্দ্ববাদকে সমৃদ্ধ করেছেন।

তিনি এঙ্গেলসের স্বাধীনতার সূত্রায়ণ সংশোধন করে দেখিয়েছেন স্বাধীনতা কেবল প্রয়োজনের উপলব্ধি নয় তার রূপান্তরও। জ্ঞানের তত্ত্বে তিনি বিকশিত করেন গভীর দ্বান্দিক উপলব্ধি যার কেন্দ্র হচেছ এর নিয়ম রচয়িতা দুটি উলম্ফন (অনুশীলণ থেকে জ্ঞান, আর তার বিপরীত, কিন্তু জ্ঞান থেকে অনুশীলন হচেছ প্রধান)। তিনি দ্বন্দ্বের নিয়মকে পান্ডিত্যপূর্ণভাবে রাজনীতিতে প্রয়োগ করেছেন এবং অধিকন্তু ব্যাপক জনগণের মধ্যে দর্শনকে নিয়ে গেছেন সেই কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমে যা মার্কসের বাকী ছিল।

মার্কসবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতিতে, চেয়ারম্যান মাও ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মধ্যকার সম্পর্ককে বিশেষণ করেন এবং "উৎপাদিকা শক্তি" সংক্রান্ত সংশোধনবাদী থিসিসের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত টানেন যে উপরিকাঠামো তথা চেতনা ভিত্তিকে রূপান্তর করতে পারে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তিকে বিকশিত করা যায়। রাজনীতি হচেছ অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ, লেনিনবাদী এই ধারণাকে বিকশিত করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যে, রাজনীতিকে অবশ্যই কমান্ডে থাকতে হবে (সর্বস্তরে প্রযোজ্য) এবং রাজনৈতিক কাজ হচেছ অর্থনৈতিক কাজের প্রাণসূত্র যা স্রেফ এক অর্থনৈতিক পলিসি নয় বরং আমদের রাজনৈতিক অর্থনীতির সত্যিকার সমাধানে নিয়ে যায়।

মহান অগ্রগামী উলম্ফণ ও সমাজতান্ত্রিক বিকাশের প্রবক্তা মাও তাঁর কমরেডদেরসহ চীনে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণে প্রবল সংগ্রামের মুখে পড়েই উপলব্ধি করলেন যে সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণকে একটি পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শিক রাজনৈতিক লাইন হিসেবে তুলে ধরতে হবে। এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কমরেড স্তালিনের আমল থেকেই যে বিচ্যুতিতে গড়িয়ে

পড়ে তা চীনেও প্রতিফলিত হয়। সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধেই ঐসব ভ্রান্তি সংশোধনবাদের জন্য জায়গা করে দিয়েছিল। উৎপাদিকা শক্তির তত্ত্বের প্রাথমিক যে প্রবণতা স্তালিনের রচনায় খুঁজে পান তাকে মাও একে একজন কমিউনিস্টের ভুল হিসেবেই দেখেছেন।

সমাজতন্ত্রের বিনির্মাণকে মাও প্রবল গণ আন্দোলন হিসেবে দেখেছেন। মাও ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক বিশেষণ করেন। উৎপাদন সম্পর্ক ও উপরিকাঠামোর অব্যাহত বিপবীকরণের কথা বলেন। মহান অগ্রগামী উলম্ফণ রূপে জনগণের সাহসী প্রবল অতিকায় প্রচেষ্টাকে এভাবে দেখতে হবে। স্তালিন ও সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ ভুলবশতঃ মনে করেছিলেন যে সমাজতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানা আর উৎপাদিকা শক্তির কিছুটা বিকাশ। মাও লক্ষ্য করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদন সম্পর্কের অগ্রগতি মৌলিকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। মাও শিক্ষা দেন যে উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মালিকানা ব্যবস্থাই নির্ধারক, তবে সমাজতন্ত্রের অধীনে গণমালিকানাকে সারবস্তু ও রূপ উভয়তই সমাজতান্ত্রিক হতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ব্যবস্থার সাথে উৎপাদন সম্পর্কের অন্য দুটো দিকের যথা উৎপাদনে নিযুক্ত মানুষে মানুষে সম্পর্ক, ও বন্টন ব্যবস্থার আন্তঃক্রিয়ার ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন। মাও দেখিয়েছেন যে আমলাতান্ত্রিক নির্দেশ দ্বারা নয় বরং জনগণের উদ্যোগ বাড়ানোর মাধ্যমেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি দৃঢ়ভাবে নির্মাণ করা যায়। মাও 'বুর্জোয়া অধিকার'-এর ভাবাদর্শের ওপর অব্যাহত আঘাত হানার আহ্বাণ জানান।

মাও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বহু নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করেন যথা, ভারী শিল্পকে কেন্দ্রে রেখে হালকা শিল্প ও কৃষির যুগপৎ বিকাশ, রাজনীতি কমাণ্ডে, লাল ও দক্ষ, বৃহৎ ও গণ, আংশিক গুণগত রূপান্তর, ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতা, নিবিড় কর্মসূচী, গণমালিকানার রূপান্তর, দুই পায়ে হাটা তথা আত্মনির্ভরশীলতাভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিনির্মাণ, যৌথস্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া, উৎপাদনের যৌথ পরিচালনা, দুই অংশগ্রহণ(শ্রমিকদের ব্যবস্থাপণায় অংশগ্রহণ, ব্যবস্থাপণার উৎপাদনশীল শ্রমে অংশগ্রহণ), মহান অগ্রগামী উলম্ফণঃ "অধিক! দ্রুততর! অধিকতর ভাল!অধিকতর মিতব্যয়ীভাবে!", প্রাচীন নিয়মকানুন ও কুসংস্কারের বিলোপ, বুর্জোয়া অধিকারের ভাবাদর্শের ধ্বংস, পরিকল্পনা প্রণয়ন, ইত্যাদি বহুকিছু।

সুতরাং, চেয়ারম্যান মাওই প্রথম সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর একটা বৈজ্ঞানিক ও সার্বজনীন চিন্তার বিকাশ সাধন করেন।

প্রায়ই একটি ব্যাপারকে তার গুরুত্ব সত্ত্বেও পাশে ফেলে রাখা হয়, বিশেষত তাদের কর্তৃক যারা গণতান্ত্রিক বিপব পরিচালনা করছেন, সেটা হচেছ আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ সংক্রান্ত মাওবাদী থিসিস অর্থাৎ সেই পুঁজিবাদ যা নিপীড়িত দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন মাত্রার সামন্তবাদের ভিত্তিতে অথবা এমনকি প্রাক-সামন্তবাদী স্তরসমূহের ভিত্তিতে গড়ে তুলছে। এটা হচেছ একটা মহাগুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, প্রধানত, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়। একজন ভালো রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ সংক্রান্ত উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত হয়, যেখানে আমলাতান্ত্রিক পুঁজির বাজেয়াপ্তকরণ দ্বিতীয় স্তর হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বিপব পরিচালনার অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠন করে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে, চেয়ারম্যান মাও সামাজিক শ্রেণীসমূহের তত্ত্বকে আরো বিকশিত করেন তাদেরকে অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক ভিত্তিতে বিশেষণ করার মাধ্যমে। তিনি বিপবী সহিংসতাকে ব্যতিক্রমহীন সার্বজনীন নিয়ম হিসেবে তুলে ধরেন, এক শ্রেণীর দ্বারা আরেক শ্রেনীর সহিংস প্রতিস্থাপন হিসেবে বিপব, এভাবে এই মহান থিসিস প্রতিষ্ঠা করেন যে "বন্দুকের নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়িয়ে আসে"। তিনি নিপীড়িত দেশগুলোতে গ্রামাঞ্চল দিয়ে শহারাঞ্চল ঘেরাওয়ের পথের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন সমাধান করেন তার সাধারণ নিয়মসমূহ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে। তিনি সমাজতন্ত্রে শ্রেণীসংগ্রাম সংক্রান্ত তত্ত্ব সূত্রায়িত ও বিকশিত করেন, যাতে তিনি প্রতিভাদীপ্তভাবে উলেখ করেন যে সর্বহারা শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক পথ ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যে এবং সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে বৈর সংগ্রাম চলে। সমাজতন্ত্রে এটা মূর্তভাবে নির্ধারিত হয়নি কে কাকে পরাজিত করবে, এটা হল একটা সমস্যা যার সমাধান সময় দাবী করে, পুনপ্রতিষ্ঠা ও পাল্টা পুনপ্রতিষ্ঠার এক প্রক্রিয়ার শুরু, সর্বহারা শ্রেণীর জন্য শক্তিশালীভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার দখল রাখা--অবশ্যই সর্বহারা একনায়কত্বের মাধ্যমে এবং চুড়ান্তভাবে ও প্রধানত ঐতিহাসিক কালজয়ী চমৎকার সমাধান আর তা হচেছ সর্বহারা একনায়কত্বধীন বিপবকে অব্যাহত রাখতে মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপব।

নয়া গণতান্ত্রিক বিপব হচ্ছে মাওয়ের একটি তত্ত্ব যা দেখিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপবের এই যুগে বুর্জোয়ারা আর গণতান্ত্রিক বিপব করতে সক্ষম নয়। একাজটি সর্বহারা শ্রেণীর দায়িত্ব হিসেবে ইতিহাস কর্তৃক অর্পিত হয়েছে। কিন্তু সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে এই গণতান্ত্রিক বিপব আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপবের অংশ এবং এর লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। এই বিপব অব্যাহতভাবে সমাজতন্ত্র অভিমুখে এগিয়ে যাবে।

কমরেড মাও এক নতুন ধরণের পার্টির ধারণা বিকশিত করেন যা বিপরীতের ঐক্যভিত্তিক অর্থাৎ দুই লাইনের সংগ্রাম ভিত্তিক পার্টি গড়ে তোলা যা গনযুদ্ধ সুচনা ও বিকাশে সক্ষম, নিপীড়িত সকল শ্রেণীসমূহকে ঐক্যবদ্ধ ও নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। মাও এক নতুন ধরণের বাহিনীর ধারণা বিকশিত করেন যা জনগনের কাছে বোঝা হবেনা বরং উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকবে।

যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে চেয়ারম্যানের একটি তত্ত্ব যা নিপীড়িত দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত হয়ে শ্রমিক কৃষক মৈত্রির ভিত্তিতে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের নিয়ে একটি ফ্রন্ট।

'গণযুদ্ধ' রূপে চেয়ারম্যান মাও সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণীর সামরিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এতে প্রথমবারের মতো একটি নিয়মমাফিক ও পূর্নরুপে সারসংকলিত হয়েছে সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত সংগ্রাম, সামরিক এ্যাকশনসমূহ ও যুদ্ধসমূহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বিশেষত চীনের বিরতিহীন যুদ্ধসমূহ। গনযুদ্ধ শুধু নিপীড়িত দেশগুলিতে নয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেও প্রযোজ্য। এটা স্রেফ গেরিলা যুদ্ধ নয়। গেরিলা যুদ্ধ থেকে চলমান যুদ্ধ ও অবস্থান যুদ্ধে তা বিকশিত হয় গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি এলাকাসমূহ ভিত্তি করে। ঘাঁটি এলাকাসমূহ হচ্ছে চাবিকাঠি যেখানে গণকমিটির আকারে নয়া গণক্ষমতার ভ্রুণ গড়ে ওঠে।

মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপব হচ্ছে চেয়ারম্যান মাওয়ের সর্বাধিক সীমাতিক্রমকারী বিকাশ। মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপব সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির অধিবেশনে বলা হয়েছেঃ

"উৎখাত হওয়া সত্ত্বেও বুর্জোয়ারা ক্ষমতা পুনর্দখলের লক্ষ্যে শোষক শ্রেণীসমূহের পুরোনো ধারণা, সংস্কৃতি, অভ্যাস ও উপায়ের মাধ্যমে জনগণকে দূষিত করতে আর জনগণের মন জয় করার প্রচেষ্টা চালায়। সর্বহারা শ্রেণীকে করতে হবে ঠিক তার বিপরীত; মতাদর্শগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের সকল চ্যালেঞ্জের প্রতি সে নির্দয় মুখোমুখি আঘাত ছুঁড়ে দেবে এবং তার নিজস্ব নতুন ধারণা, সংস্কৃতি, অভ্যাস ও উপায়ের মাধ্যমে

সমগ্র সমাজের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাবে। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য হচ্ছে সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করা কর্তৃপক্ষের মধ্যে যারা পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করছে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া 'কর্তৃপক্ষসমূহ' কে সমালোচনা ও অপসারণ করা, বুর্জোয়া ও অন্যান্য শ্রেণীসমূহের মতাদর্শকে সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যান করা, এবং সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তির সাথে অসাঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা আর উপরিকাঠামোর অবশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহকে রূপান্তর করা যাতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুসংহতকরণ ও বিকাশে সহায়তা করা যায়।"

চেয়ারম্যান মাও মৃত্যু পরবর্তীতে পিসিপি চেয়ারম্যান গনসালোর নেতৃত্বে মাওবাদের সূত্রায়ণ শুরু হয়। গণযুদ্ধের সার্বজনীনতা একটি উলে-খযোগ্য ধারণা যা বিকশিত হয় গনজালো কর্তৃক। পেরু ও নেপালের গণযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মাওবাদ শক্ত ভিত পায় ও বিকশিত হয়। ১৯৮৪ সালে রিম গঠিত হয়েছিল চতুর্থ আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে। '৯২ সালে আন্তর্জাতিক যৌথ উপলব্ধি রূপে মাওবাদের গ্রহণ ছিলো বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্টদের এক বিরাট বিজয়। মার্কস ও এঙ্গেলস থেকে আমরা পেয়েছি মার্কসবাদ। লেনিন ও স্তালিন থেকে লেনিনবাদ। মাও, সিরাজ সিকদার, চারু মজুমদার, গনসালো প্রমুখ থকে আমরা পাই মাওবাদ। এসব হচ্ছে গাছের গোড়া। এথেকে ডালপালা আসে মালেমার রাজনীতি, অর্থনীতি ও দর্শন।

সভাপতি সিরাজ সিকদার মাওচিন্তাধারাকে গ্রহণ করেন আর পূর্ববাংলায় গণযুদ্ধের মাধ্যমে তার প্রয়োগ ঘটান। এভাবে বাংলাদেশে সিরাজ সিকদার চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। সিরাজ সিকদারের দরকার ছিল প্রথমে মতাদর্শিক খুঁটি প্রথিতকরণ। সবকিছুর মূলে হচ্ছে এটা। রাজনীতিরও মূলে এটা। এহচ্ছে এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী যার দ্বারা রাজনীতির কাঠামো গড়ে ওঠে। কমরেড চারু মজুমদার মাওচিন্তাধারাকে গ্রহণ করেন আর ভারতের বাস্তবতায় গণযুদ্ধের মাধ্যমে তার প্রয়োগ ঘটান। যার প্রভাব বলয় দক্ষিণ এশিয়াকে ছাপিয়ে যায়। এভাবে চারু মজুমদার শিক্ষা গড়ে ওঠেছে।

অপরদিকে পেরুর বিপবের বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত হয়ে আন্তর্জাতিকভাবে মাওবাদের সার্বজনীনতা আবিষ্কারের মাধ্যমে গনসালো চিন্তাধারা জন্ম নিয়েছে। কমরেড গনসালোই দেখান যে গণযুদ্ধ সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিকাশসংক্রান্ত তত্ত্ব তিনি বিকশিত করেছেন। গনসালো থেকে আমরা দুই লাইনের সংগ্রামের নির্ধারক গুরুত্ব, মিলিশিয়া, পার্টি-বাহিনী-ফ্রন্টের সমকেন্দ্রিক বিনির্মাণ, গণক্ষমতার প্রশ্ন, কৃষি বিপব, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ সংক্রান্ত তত্ত্ব, পরিকল্পিত উপায়ে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা, শহর গ্রামের সমন্বয়, মহান নেতৃত্বের তত্ত্ব ইত্যাদি বহু কিছু পেয়েছি।

কমরেড গনসালো থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সিরাজ সিকদার ও চারু মজুমদারের চিন্তাধারাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ণ করতে পারি। সিরাজ সিকদার চিন্তাধারা থেকে আমরা পাই, ঘাঁটি গড়ে তোলার লাইন-এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের লাইন, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ সংক্রান্ত তত্ত্ব, কৃষি বিপব, সাম্প্রদায়িক শ্রেণীদ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তত্ত্ব, জাতীয় সংগ্রাম, ভৌগলিকতার ব্যবহার, উপনিবেশ সংক্রান্ত তত্ত্ব, শহর গ্রামের সমন্বয়, মিলিশিয়া, মহান নেতৃত্বের তত্ত্ব, ইত্যাদি আরো বহু কিছু। মালেমা হচ্ছে মাও চিন্তাধারার বিকশিত রূপ। মাওবাদের তত্ত্ব গনসালো কর্তৃক পুনরাবিস্কৃত হয়েছে এবং তাঁর মাধ্যমে রিম এবং রিমের মাধ্যমে দুনিয়ার মাওবাদীরা গ্রহণ করেছে। এসকল নীতিমালা সবই মূর্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা আজকের দিনের নয়া মালেমাবাদী পার্টি গড়ার ভিত্তি।

মাওবাদ, মালেমা, প্রধানত মাওবাদ সবই হচ্ছে সংশেষন। কিন্তু আমরা জানি, সংশেষণ ও বিশে-ষণ হচ্ছে একই বস্তুর দুই দিক। এর মধ্যে সংশে-ষণ হচ্ছে প্রধান। কিন্তু এটাও একটা অন্তহীন প্রক্রিয়া। মালেমাকে সংশেষিত করে বলা হয় মাওবাদ, আবার মালেমাকে বিশেষণ করে নতুন সংশেষণ, প্রধানত মাওবাদ। তবে, সংশেষণ বলেন আর বিশেষণ বলেন সবই প্রয়োজন থেকে। সর্বহারা শ্রেণীর শ্রেনীসংগ্রামের স্বার্থেই এসবকিছু। মহাবিশ্বে বস্তুজগত অবিচ্ছিন্ন। আমাদের বিচারের প্রয়োজনে আমরা তাকে বিচ্ছিন্ন করে নেই। আবার তাকে যথাস্থানে স্থাপন করতে হয়। জ্ঞানের রাজ্য একটাই, কিন্তু আমরা বলি দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প সাহিত্য..।

মালেমায় রয়েছে তিনটি মাইলস্টোন মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ। শেষেরটি হচ্ছে বিকাশের সর্বোচ্চতা। তাই শ্রেষ্ঠতর। এভাবে মূর্তকরণ করাটা মাওবাদকে প্রতিষ্ঠার সাথে ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। পেরুর কমিউনিস্ট পার্টিকে মাওবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছে। সিরাজ সিকদার ও চারু মজুমদার মাওবাদের তৎকালীন সর্বোচ্চ বিকাশকেই ধারণ করতেন। সেসময় মাওচিন্তাধারা বলা হতো। মাওচিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা কঠোর কঠিন সংগ্রাম চালিয়েছেন।

কমরেড সিরাজ সিকদার, কমরেড চারু মজুমদার ও কমরেড গনসালো মতাদর্শের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন, ভ্রান্ত পথের পথিকরা এটা স্বীকার করতে চায়না। তাহলে, তাদের অবদান কি অ-মতাদর্শ? মতাদর্শ কীভাবে উদ্ভূত হয়? সিরাজ সিকদার ও চারু মজুমদার বাংলাদেশ ও ভারতের বিপবের মৌলিক অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারেননি বলতে চাইছে এরা। এদেশের বিপবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করাটাই, একটি মৌলিক সমস্যার সমাধান। এসব ভ্রান্ত চিন্তানুসারীদের মত অনুসারে মার্কসবাদকে এখন নেতিকরণ করা যাবে। কিন্তু বস্তুবাদের নিয়মনুসারে তা হতে পারেনা। প্রত্যেকটি বস্তু বা ঘটনার রয়েছে জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি। বস্তুকে এই সীমার মধ্যে দেখতে হবে। মার্কসবাদের জন্ম হয়েছে কমিউনিস্ট সমাজের আদর্শকে ধারণ করে। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত তা নেতিকৃত হবে না। এই কালপর্বের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে মার্কসবাদেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। তবে তা আরো উন্নত কিছু জন্ম দেবে। অর্থাৎ আরো অগ্রসর কিছু দ্বারা নেতিকৃত হবে। অপরদিকে সংশোধনবাদ কখনোই মার্কসবাদকে নেতিকরণ করতে পারবে না, কারণ তার সেই শক্তি নেই। ভ্রান্ত পথের পথিকদের মতে, "চিন্তাধারা" কোন দেশীয়/রাষ্ট্রীয় বিষয় হতে পারে না। যেন আন্তর্জাতিকভাবে উদ্ভূত হয়ে চিন্তাধারাকে কোন দেশে হাজির হতে হবে। মানুষকে যেমন কোন না কোন দেশে বাস করতে হচ্ছে, চিন্তাধারাকেও কোন না কোন দেশে জন্ম নিতে হচ্ছে, তারপর সেটা আন্তর্জাতিক চরিত্র পরিগ্রহ করে।

মাওয়ের একটি তত্ত্ব হচ্ছে আংশিক গুণগত রূপান্তরের তত্ত্ব। তাই ভাববাদীরা যেমনটা মনে করে তেমন হঠাৎ করেই নবম কংগ্রেসে মাও চিন্তাধারা বিশ্বজনীনভাবে আবির্ভূত হয়নি। এ কোন অলৌকিক ঘটনা নয়। মাও ১৯৩৬ সালে দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে ও অনুশীলন প্রসঙ্গে লেখেন, দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ, আধা-সামন্তাবদী আধা ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর বিশেষণ, নয়াগণতান্ত্রিক বিপব, সমাজতন্ত্রের পথে মহান অগ্রগামী উলম্ফণ, সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপব এগুলো একেকটা পর্বে এসেছে। ডিম থেকে পিউপা, পিউপা থেকে মথ, মথ থেকে রেশম পোকা; মানুষের শৈশব থেকে তারুণ্য, তারুণ্য থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রবীণ বয়স, প্রবীণ বয়স থেকে বৃদ্ধ...ইত্যাদি হচ্ছে মাও বর্ণিত আংশিক গুণগত রূপান্তরের উদাহারণ। প্রকৃতির ক্ষেত্রে যা ঘটে, সমাজের ক্ষেত্রে যা ঘটে মানুষের চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও তাই

ঘটে। ১৯৩৫ সালের মাওচিন্তাধারা আর ১৯৬৯ সালের মাওচিন্তাধারা এক ছিলনা, আর ১৯৬৯ সালের মাওচিন্তাধারা আর আমরা যাকে মাওবাদ বলছি তাও এক নয়, সবই সার্বজনীন কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। কমিউনিস্ট ইশতেহারের মার্কসবাদ, পুঁজির মার্কসবাদ, আর প্যারি কমিউন পরবর্তী মার্কসবাদ---সবই সার্বজনীন কিন্তু সমান নয়। বিভিন্ন স্তরের।

মার্কস ও এঙ্গেলস মার্কসবাদের রচয়িতা যার মধ্যে মার্কসের ভূমিকা প্রধান। লেনিন ও স্তালিন লেনিনবাদের রচয়িতা যার মধ্যে লেনিনের ভুমিকা প্রধান। মাও, সিরাজ সিকদার, চারু মজুমদার, গনসালো...থেকে আমরা পেয়েছি মাওবাদ, যাতে মাওয়ের ভুমিকাই হচ্ছে মুখ্য। সার্বজনীনতা এমনি এমনি হয়না, সেটাকে অর্জন করতে সংগ্রাম করতে হয়, তার স্বীকৃতির জন্যও সংগ্রাম করতে হয়।

আসুন আমরা একটু বিস্তারিতভাবে দেখি সিরাজ সিকদারের চিন্তা ও কর্মকে। সিরাজ সিকদার হচ্ছেন বাংলাদেশের মহানতম সন্তান যিনি এখানে সর্বহারা শ্রেণীকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশ হিসেবে মাও চিন্তাধারাকে হাতে তুলে নিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই ভিত্তিতে তিনি সঠিকভাবে পূর্ববাংলার সমাজকে ঔপনিবেশিক-আধা সামন্তবাদী হিসেবে বিশেষণ করেন এবং সর্বহারা শ্রেণীকে নেতৃত্ব দেন তাঁর নিজ পার্টি গড়ে তুলতে, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাঁর বাহিনী গড়ে তোলায়, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমাবেশিত করার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট গঠনে। তাঁর নেতৃত্বে পার্টি দুইবার ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলায় সক্ষম হয়ঃ একবার বরিশাল জেলার বদ্বীপের পেয়ারাবাগান অরণ্যে, আর পরবর্তীতে '৭২-'৭৫ সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে। তাঁর এই ধারণার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ছিল যে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের উপনিবেশ এবং পরবর্তীতে ভারতের উপনিবেশ। সেই বিশেষণ থেকে তিনি এগিয়ে যান সর্বহারা শ্রেণীকে জাতীয় মুক্তির জন্য লড়তে নেতৃত্ব দিতে। তার উপলব্ধি ছিল যে সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্ত সকল দেশই সারবস্তুতে উপনিবেশ এবং আধা উপনিবেশের উপনিবেশ থাকতে পারে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি পরিষ্কারভাবে তার এই ধারণাকে সঠিক প্রমাণ করে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক বাংলার সাম্প্রদায়িক শ্রেণী দ্বন্দ্বের ওপর তাঁর একটা ভাল উপলব্ধি ছিল। দক্ষিণ এশিয়ার সাধারণ পরিস্থিতি এবং সমকালীন বিশ্ব এই ধারণাকেও সঠিক প্রমাণ করে। তিনি পূর্ববাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে মূর্ত করেন এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই নিশানাবদ্ধ করেন। তার উপলব্ধি ছিল এই যে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং আধা-সামন্তবাদের প্রতিনিধি। এটাও হচ্ছে একটা নির্ধারক চিন্তা যা আজকের বিশ্ব কমিউনিস্টদের অতি অবশ্যই বুঝতে হবে। সভাপতি সিরাজ সিকদারের মৃত্যু পরবর্তীতে হোজাপন্থী জিয়াউদ্দিন মাও সেতুঙ চিন্তাধারা ও সিরাজ সিকদারের লাইন বর্জন করে। অপরদিকে আনোয়ার কবীর মাও চিন্তাধারার বিকশিত অবস্থান মাওবাদকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় এবং সিরাজ সিকদারের চিন্তাধারাকে সংশোধন করার মাধ্যমে সমন্বয়বাদ দ্বারা পরিচালিত হয়।

আর্থ সামাজিক বিশেষণ

মাওসেতুঙ আধা উপনিবেশিক আধা সামন্তবাদী সমাজ কাঠামোর যে ধারণা দিয়েছেন তা হচ্ছে--

১. সামন্তবাদের গর্ভে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিকাশ সামন্তবাদের পরিবর্তন ঘটিয়ে যে পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে সেটা না সামন্তবাদ না পুঁজিবাদ, আবার এই দুইয়েরই বৈশিষ্ট এতে বিরাজমান। একে আধা সামন্তবাদী এজন্য বলা হয় যে সামন্তবাদের ভিত্তির ওপর পণ্য অর্থনীতি গড়ে ওঠেছে। সামন্তবাদী শোষণ পদ্ধতিকে এটা কাজে লাগায়। পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট হচ্ছে--

পণ্য অর্থনীতি, শ্রমশক্তিও পণ্য

বর্ধিত পুনরুৎপাদন

এতে অবশ্যম্ভাবীরূপে উদ্বৃত্তমূল্য শোষণের একটা প্রক্রিয়া চালু হয় অর্থাৎ দেশীয় ভিত্তিক ভারীশিল্প গড়ে ওঠে।

আমাদের দেশে পণ্য অর্থনীতি বিরাজমান। কিন্তু শোষণের পদ্ধতি সামন্তবাদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অর্থাৎ সামন্তবাদের শোষণপদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়। যেমন-- ১. অদেয় মজুরী

২. অর্থনীতি বহির্ভূত বল প্রয়োগ

৩. অতিরিক্ত শোষণ (অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য)

৪. দীর্ঘ শ্রমসময়।

আমাদের দেশে একটা বিরাট শ্রমিক শ্রেণী রয়েছে। দেশের জনসংখ্যার এক ততিয়াংশই শ্রমিক জনগণ। এর অর্ধেকের বেশী শিল্প শ্রমিক যাদের অধিকাংশই আবার তৈরি পোষাক শিল্পে কর্মরত। এছাড়া বস্ত্র বুনন, পাট, চামড়া, পোল্ট্রি ও ওষুধ শিল্পে বহু শ্রমিক কর্মরত। পরিবহন, হোটেল-রেঁস্তোরা ও নির্মাণ সেক্টরে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী এখানে হাড়ভাঙা শ্রম প্রদান করেও তাদের পরিবারের ভরণ পোষণের তিন ভাগের একভাগ মজুরিও পাননা। তাদের কর্মদিবস অত্যন্ত দীর্ঘ। প্রায়ই বেগার খাটতে হয়। তারা অতিরিক্ত উদ্বৃত্তমূল্য শোষণের স্বীকার। বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকেই বহু লড়াই সংগ্রাম বিদ্রোহ সংঘটিত করেছেন। ফলে তারা যথেষ্ট পরিপক্ক। শৃংখল ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর হারানোর কিছু নেই। জয় করার জন্য রয়েছে সারা দুনিয়া। শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে বিপবের নেতা। সে বিপবে কমিউনিস্ট পথের গ্যারান্টি। সে কৃষক জনগনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কৃষক-শ্রমিক জোট গঠন করে যা হচ্ছে ফ্রন্টের ভিত্তি।

আমাদের দেশ কৃষি প্রধান। জনসংখ্যার ৬০-৭০% ই কৃষির সাথে যুক্ত। শতকরা ৫৬ ভাগ কৃষক পুরো ভূমিহীন, যাদের কারো বসতভিটা আছে কারো বা নেই। শতকরা ২৫-৩০ জন কৃষক গরীব কৃষক যাদের ১/২ বিঘা আবাদযোগ্য জমি রয়েছে। এদের সাধারণত কৃষি যন্ত্রপাতি নেই। মোট কৃষকের শতকরা ৮০ ভাগই গরিব ও ভূমিহীন কৃষক (দুই তৃতিয়াংশ ভূমিহীন এবং প্রায় এক তৃতিয়াংশ গরীব কৃষক)। এই দুই শ্রেণীর হাতে মোট কৃষি জমির এক ষষ্ঠাংশ রয়েছে। এই দুই শ্রেণীকে সংক্ষেপে গরীব কৃষক বলা হয়। গরীব কৃষকরা সাধারণত বর্গা, পত্তনী বা বন্ধকী জমি নিয়ে চাষ করে থাকেন। গরীব কৃষকেরা বর্গায় (ফসলের ভাগ দেয়া), পত্তনীর টাকা, কর্জের সুদ, এনজিওদের চক্রবৃদ্ধি সুদ, সরকারের ক্রমবর্ধমান খাজনা, উন্নয়ন কর, শিক্ষা কর, চৌকিদারী কর, সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি, উচ্চ মূল্যে সার, কীটনাশক, সেচের পানি ক্রয়, পাওয়ার টিলারের চাষের দাম ও সর্বোপরী মজুরি খাটায় শোষিত হয়। ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রয় করতে হয়। এটাই হচ্ছে মাঝারি চাষীদের থেকে তাদের পার্থক্য। গরীব কৃষকেরা হচ্ছেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যাদেরকে বলা হয় আধা-সর্বহারা। এরাই হচ্ছেন বিপবের ভিত্তি। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে প্রধানতঃ এদের ওপর নির্ভর করেই গণযুদ্ধ গড়ে ওঠে।

৫/৬ বিঘা জমি রয়েছে এমন কৃষকদের মাঝারী কৃষক ধরা যায় যারা মোট কৃষকের শতকরা ১০-১৫ জন। এদের অনেকের অগভীর নলকুপ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তেলের দাম অনেক বেশি হওয়ায় অগভীর নলকুপ ব্যবহার লাভজনক নয়। বরং ভূস্বামীরা গভীর নলকুপ ব্যবহারে বিদ্যুতে সরকারী ভর্তুকী পেয়ে থাকে। মাঝারি কৃষকদের আয়ের সম্পূর্ণ বা প্রধান অংশ আসে নিজের শ্রম থেকে। সাধারণতঃ সে অন্যকে শোষন করেনা। বরং বছর শেষে বর্গার অংশ দেয়া, পত্তনীর টাকা,

কর্জের সুদ, সরকারের ক্রমবর্ধমান খাজনা, উন্নয়ন কর, শিক্ষা কর, চৌকিদারী কর, উচ্চ মূল্যে সার, কীটনাশক, সেচের পানি ক্রয়, পাওয়ার টিলারের চাষের দাম প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেই শোষিত হয়। কিছু কিছু মাঝারি চাষী কিছু কিছু শোষণ করলেও তা তাদের নিয়মিত বা আয়ের প্রধান উৎস নয়। মাঝারি চাষীরা সহজেই বিপবী প্রচারণা গ্রহণ করে। শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি গরীব কৃষকদের ওপর নির্ভর করে মাঝারি কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করবে, বিদ্যমান আধা-সামন্ততান্ত্রিক বড় ধনীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে ও ভূমি সংস্কার করবে। ৭/৮ বিঘার থেকে ১০/১২ বিঘা জমির মালিককে ধনী কৃষক ধরা যায়। মোট কৃষকের এরা হচ্ছে শতকরা ৪/৫ জন। কোন কোন ধনী চাষীর কিছু জমি পত্তনী বা বন্ধক নেয়া বাকীটা নিজের। আবার অনেকের সবটাই পত্তনী বা বন্ধক নেওয়া। সাধারণতঃ ধনী চাষীর অগভীর নলকুপ রয়েছে এবং বেশি টাকা আছে। সে নিজে শ্রমে অংশ নেয়, কিন্তু তার শোষণের প্রধান ধরণ কামলা বা মজুর খাটানো। আবার সে নিজেও বর্গা বা পত্তনী বা বন্ধক দেয়। সে টাকা কর্জ দিতে পারে বা ব্যবসাও করতে পারে। এরা বিপবে সাধারণতঃ নিরপেক্ষ থাকে। তবে এদের স্বার্থ বিপবে রক্ষিত হয়। ১০/১২ বিঘা জমিকে আমরা সিলিং ধরে এর বেশি জমি আমরা কৃষি বিপবে বাজেয়াপ্ত করবো। সুতরাং ধনী কৃষকদের সিলিং উর্ধ্ব জমিই কেবল বাজেয়াপ্ত করা হবে। এদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এদের পুঁজি ছোট হওয়ার কারণে এদের আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীর বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। মাঝারি ও ধনী কৃষকদের হাতে এক তৃতিয়াংশ জমি রয়েছে। সাধারণত ২০ বিঘার উর্ধে সেইসব জমির মালিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক বড় ধনী যাদের জমি ছাড়াও অন্যবিধ সম্পত্তি রয়েছে, এরা শতকরা ২/৩ জন। খাস জমিসহ ধরলে এদের হাতে রয়েছে অর্ধেকের বেশি জমি। বড় ধনীদের কৃষি জমি ছাড়াও ট্রাক্টর, গভীর নলকুপ, সার, তেল ও কীটনাশকের ব্যবসা রয়েছে। এরা সেচকাজে বিদ্যুৎসহ বিভিন্নরকম সরকারী ভর্তুকী পেয়ে থাকে। এদের প্রায় সবারই শহরে বাড়ী রয়েছে। এরাই গ্রামাঞ্চলে ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বর এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা। এরাই সুদখোর এনজিওসমূহের কর্মকর্তা, থানা পুলিশ কোর্ট কাচারীর কর্তা, এরাই হাট বাজারের ইজারাদার। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের মাধ্যমেও এরা শোষণ করে থাকে। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদীকারবার করে থাকে এরা। এরা জুয়ার আসর পরিচালনা করে। এদের অনেকেরই বাড়ীতে বন্দুক আছে। এনজিওদের সাথে মিলে এরাই হচেছ গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের প্রধান শত্রু। কৃষি বিপবে এদের জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এরা সাধারণতঃ টাউট ও নিষ্টুর লোক। গ্রামাঞ্চলে এরা দেশী ও বিদেশী সকল শোষণের স্তম্ভ। এরা দীর্ঘমেয়াদী কামলা খাটায়। মজুরদের খাটিয়ে এরা অতিরিক্ত উদ্বৃত্তমুল্য শোষণ করে থাকে। গরীব কৃষকদের এরা ভাগা, পত্তনী, সুদ বিভিন্নভাবে অতিরিক্ত শোষণ করে। এরাই যুগ যুগ ধরে কৃষকদের জমি শোষণ ও দুর্নীতির মাধ্যমে গ্রাস করেছে। গ্রামীন ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, ঠেঙ্গামারা সহ সকল এনজিও সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে চক্রবৃদ্ধি সুদী শোষণের জাল বিস্তার করেছে। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ গরীব কৃষক পরিবার এদের জালে আটকা পড়েছেন। এরা গরীবকৃষকদের উদ্বৃত্তমূল্য অতিরিক্ত শোষণ করে। এরা সাম্রাজ্যবাদের অর্থে গড়ে ওঠা একচেটিয়া সংস্থা। গরীব কৃষকদের শোষণ করে গড়ে ওঠে এদের বৃহৎ পুঁজি। গ্রামাঞ্চলে এরা কমদামী সোলার প্যানেল কিস্তিতে কৃষকদের কাছে চক্রবৃদ্ধি সুদসহ বহুগুণ বেশি দামে বিক্রী করে। এধরণের বহুবিধ ধরণের শোষণ তারা পরিচালনা করে। গ্রামাঞ্চলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক বড় ধনী শ্রেণীর অংশ হিসেবে এরা প্রধান শত্রুর মধ্যে পড়ে।

কৃষি জমির ১/৬ অংশ বর্গার অধীন। এক তৃতিয়াংশ কৃষক বর্গা, পত্তনি, বন্ধকি জমি চাষ করে থাকেন, যদিও অনেকে নিজের জমিও চাষ করেন। বাংলাদেশে এখন জমি বন্ধক নিয়ে চাষাবাদ করা ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে। যেসব ক্ষয়িষ্ণু কৃষক জমি বন্ধক রেখে থাকেন তারা সাধারণতঃ টাকার অভাবে তা আর উঠাতে পারেননা। শেষ পর্যন্ত জমি তাদেরকে বিক্রী করে দিতে হয়। এছাড়া খাই খালাসী বিভিন্ন ধরণের চুক্তিতে কৃষকেরা জমি নিয়ে চাষাবাদ করে থাকেন।

প্রাক উপনিবেশিক আমলে বাংলার কৃষি থেকে কর ও খাজনারূপে সামন্তবাদী শোষণ চালানো হতো। বৃটিশ আমলে কৃষকদের সরাসরি শোষণ করতো তিনটি প্রধান শোষকশ্রেণীঃ জমিদার, জোতদার, মহাজন। বৃটিশরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারী ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করে অনেক পুরোনো জমিদারদের ধ্বংস করে নয়া জমিদার সৃষ্টি করে রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে উপনিবেশিক শোষণ কায়েম করে।

পাকিস্তানী উপনিবেশিক আমলে ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ত্ব আইন সামান্য জমিই খাস হিসেবে অধিগ্রহণ করে, প্রায় ৪৬৫১৩৯ একর। অধিকাংশ জমিই বেদখল হয়। বেদখল হওয়া জমি উদ্ধারও ভুমি বিপবের একটা অংশ।

সুতরাং পূর্ববাংলার ইতিহাসে কখনোই কোনো ভূমি সংস্কার হয়নি। তাই কৃষকদের জমির ক্ষুধা মেটেনি। ভূমিহীনদের বড়ো অংশ শহরে রিকশা শ্রমিক হিসেবে, গার্মেন্টস ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হয় জমি হারিয়ে অথবা জমি না পেয়ে। ফলতঃ এদের সমস্যা কৃষি সমস্যার সাথেই যুক্ত। ভূমি বিপব তথা কৃষিবিপবই কৃষক জনগণ ও শ্রমজীবি জনগণের বড়ো অংশের সমস্যার সমাধান করবে। আমাদের দেশের সামন্ততন্ত্রের পুরোনো কাঠামো যেটা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলেই আধা-সামন্ততন্ত্রে প্রবেশ করেছে তার কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে। তা হচ্ছে ক্লাসিক সামন্তশ্রেণীর পতন ও মূলতঃ বিলোপ। ব্রিটিশ আমলে পূর্ববাংলার মুসলমান প্রজা চাষীদের ওপর হিন্দু ধর্মাবলম্বী সামন্ত জমিদাররা সাধারণ শোষনের পাশাপাশি সাম্প্রাদায়িক নিপীড়ণ চালাতো। এটা সাম্প্রাদায়িক শ্রেণী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিপবের মাধ্যমে সমস্যাসমূহের সমাধান না করার কারণে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম কৃষক সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টিকে সমর্থন করে। ফলে হিন্দু সামন্তরা পূর্ববাংলা থেকে বিতাড়িত হয়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে মুসলিম ধনীদের মধ্য থেকে নয়া সামন্তরা সামন্ত চরিত্রের পাশাপাশি খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ব্যাংকিং অর্থনীতির দ্বারা পুষ্ট হয় ও তাকে পুষ্ট করে। এদের মধ্যেকার খাঁটি সামন্তদের একটি অংশ বাংলাদেশ হওয়ার ফলে বিলোপের মুখে পতিত হয় এবং নয়া উঠতি লুটেরা ধনীদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়---যাদেরকে সভাপতি সিরাজ সিকদার ছয় পাহাড়ের দালাল বলেছিলেন। ঐসব নব্য লুটেরারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের পুঁজি সঞ্চয় করে এবং কেন্দ্রীয় বুর্জোয়া অর্থনীতির অংশ হিসেবে যতটা না সামন্ত তার চেয়ে বেশি বুর্জোয়া চরিত্র পরিগ্রহ করে। গ্রামাঞ্চলে টিকে থাকে এদের নীচের স্তরে নিক্ষিপ্ত আধা-সামন্ততান্ত্রিক বড় ধনী শ্রেণী।

সুতরাং পণ্য অর্থনীতি টিকে রয়েছে সামন্তবাদী ভিত্তিতে অর্থাৎ দীর্ঘ শ্রমসময়, অতিরিক্ত উদ্বৃত্তমূল্য, অদেয় মজুরী, অর্থনীতি বহির্ভূত বল প্রয়োগ ইত্যাদি।

আদমজী, মেশিনটুলস্ ফ্যাক্টরি, কাগজকল ইত্যাদির মতো দেশীয় বৃহৎ শিল্প ধ্বংসের মাধ্যমে গার্মেন্টসের মতো যে সব শিল্প আশি দশক থেকে

এদেশে গড়ে তোলা হয়েছে তার শতকরা নব্বই ভাগ মুনাফা চলে যায় সাম্রাজ্যবাদী শপিং মল, বায়িং হাউজ ও বড় দোকানদারদের হাতে। গার্মেন্টসে বাধ্যতামূলক ওভারটাইম, অতিরিক্ত শোষণ, অর্থনীতি বহির্ভূত বল প্রয়োগ বিরাজমান। প্রায় পৌনে এক কোটি বাংলাদেশী শ্রমিক বিদেশে কর্মরত। এদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি বড় অংশ গঠন করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার মজুদ গড়ে তোলে। এইসব শ্রমিকদের অধিকাংশের দেশীয় শ্রেণীভিত্তি ক্ষুদে বুর্জোয়া। এছাড়া এদেশে গড়ে তোলা হয়েছে রপ্তানি জোন। এভাবে সাম্রাজ্যবাদ এদেশে একটি বেলুন অর্থনীতি কায়েম করেছে যা যে কোনো সময় ধ্বসে যেতে পারে। আমাদের দেশে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে রয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতা। এই বুর্জোয়াশ্রেণী অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির কর্তৃত্বে রয়েছে। কিন্তু এই শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির প্রতি নিবেদিত। সাম্রাজ্যবাদ তার পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সামন্তবাদের ভিত্তির ওপর এই পুঁজিবাদ গড়ে তুলেছে। এখানে সামন্তবাদ মানে (সামন্ত ভূস্বামী) থাকতেই হবে এমন নয়, বরং শোষণের পদ্ধতি। এবং আমাদের দেশে মূলতঃই এই ক্লাসিকাল সামন্ত অনুপস্থিত।

বৃটিশ ভারতে উনিশ শতকের শেষাংশে এদেশে বৃটিশ সমর্থক আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ গড়ে ওঠে। এই পুঁজিবাদ ছিল সামন্তবাদের সাথে যুক্ত এবং বৃটিশ উপনিবেশবাদের সেবায় নিযুক্ত। ফলে উনিশ শতকেই এদেশে সামন্তবাদ আধা-সামন্তীয় রূপান্তরে প্রবেশ করে। সুতরাং এই পুঁজিবাদ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে ১। হিন্দু সাম্প্রদায়িক আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ যার প্রতিনিধি ছিল ভারতীয় কংগ্রেস ২। মুসলিম সাম্প্রদায়িক আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ যার প্রতিনিধি ছিল মুসলিম লীগ। মহান রুশ বিপবের প্রভাবে ১৯২০ দশকে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হলেও সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের ওপর নির্ভরশীল প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবিরা পার্টির ক্ষমতা দখল করে এবং পার্টিকে বিপথে পরিচালনা করে। ফলে, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাওয়ের পথ সংজ্ঞায়িত হয়নি। এ পার্টি এদেশের কৃষক যুদ্ধসমূহকে নেতৃত্ব দিতে অস্বীকৃতি জানায়, অহিংস-অসহযোগ এবং শোষক শ্রেণীসমূহের সাথে আপোষের রাজনীতির পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এ পার্টি কমিন্টার্নের ফ্যাসিবিরোধী ঐক্যফ্রন্টের নামে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সাথে ঐক্যের লাইনে চালিত হয়। ভারতের জনগণের সাথে এ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এর সুযোগ নিয়ে ভারতকে নিজ নিজ স্বার্থে বিভক্ত করে। ফলে ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও পাকিস্তানী আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে যা ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটায়। পূর্ববাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জনগণ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম বাংলার পশ্চাদভূমিতে পরিণত হয়েছিল এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক সামন্তদের কর্তৃক শ্রেণীগতভাবে শোষিত হওয়ার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক নিপীড়ণের স্বীকার ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক এ বিশেষ দ্বন্দ্বকে বিপবের মাধ্যমে সমাধান না করায় এদেশের মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ভোট দেয়। পুনরায় পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চাদভূমিতে পরিণত হওয়ায় পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিনত হয়। মুসলিম আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক। পূর্ববাংলার জনগণকে শোষণের মাধ্যমে সেটা বিকশিত হতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি সংশোধনবাদী শান্তিপূর্ণ লাইনে চালিত হয়। জাতীয় বিকাশের জাতীয় সংগ্রাম পূর্ববাংলায় সূচিত হয় এবং মুসলিম পুঁজিবাদ ষাটের দশকের শেষে গুরুতর সংকটে পতিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়না, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালী আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিকাশের দাবী ওঠে। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ১৯৭১-এ ভারতের সহায়তায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ৬৮ সালে কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে মাওবাদী গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাওয়ের পথ সংজ্ঞায়িত হয়। ৭১-এ পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি গঠিত হয় এবং গণযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম বিকাশ লাভ করে। কিন্তু সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ আওয়ামী লীগের সহায়তায় ৭১-এর শেষে পাকিস্তানকে হটিয়ে এদেশে উপনিবেশিক শোষণ কায়েম করতে সক্ষম হয়। '৭১-এ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর রুশ-ভারতের দালাল ফ্যাসিস্ট শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামি লীগ সরকারের তত্ত্বাবধানে নতুন জন্ম নেওয়া আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা নিজেদের গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক লুটতরাজ শুরু করে। পুঁজি সঞ্চয়ের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যাপক লুটতরাজে দেশব্যাপী বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। অপরদিকে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে সারা দেশে গণযুদ্ধ গড়ে ওঠে, এই গণযুদ্ধকে ঠেকাতে এবং লুটতরাজকে নিশ্চিত করতে রক্ষী বাহিনী নামে এক ফ্যাসিস্ট বাহিনী গঠন করে সরকার, যার দ্বারা হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বিরাট গণবিদ্রোহের মুখে এক সর্বগ্রাসী সংকটে পতিত হয় রাষ্ট্রযন্ত্র। আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এক স্থায়ী সাধারণ সংকটে প্রবেশ করে। ফলে লুটপাটে পুষ্ট আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের মার্কিনপন্থী অংশটির নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে।

ফ্যাসিস্ট জিয়ার নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী হাজার হাজার বিদ্রোহী সৈনিককে হত্যা করে। সামরিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে বিএনপি নামে দল গঠন করে, তথাকথিত বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করে, যা মার্কিনপন্থী ফ্যাসিস্ট এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক শাসনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এরশাদ আট বছর সামরিক শাসন চালায়। জনগণের গণ আন্দোলন দমন করে। মাওবাদী কমিউনিস্টদের সশস্ত্র সংগ্রামকে মোকাবেলা করতে থাকে। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাকে ব্যবহার করে জাতীয় পার্টি গঠন করে। সাম্রাজ্যবাদী ঋণ ও সহযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে এরশাদ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অবকাঠামো ব্যাপকভাবে শক্তিশালি করে, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলে। '৯০ এ এরশাদ গণআন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হয়। তারপর দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট খালেদার নেতৃত্বে দুইবার আর ফ্যাসিস্ট হাসিনার নেতৃত্বে একবার তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের নেতৃত্বে বিদেশী ঋণসহযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যাংক লোনের মাধ্যমে, আর দেশীয় সম্পদ লুটপাটের মাধ্যমে বিরাট এক দুর্নীতিবাজ শ্রেণী সৃষ্টি করে। এরা দেশে এক স্থায়ী দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি করে। বারবার এদের বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে, খন্ড বিখন্ড মাওবাদী শক্তিসমূহের সশস্ত্র তৎপরতা এদের জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ফলে, খালেদা র‍্যাব নামে এক ফ্যাসিস্ট বাহিনী গঠন করে, যার নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, যা ধারাবাহিকভাবে সব সরকার চালিয়েছে, বর্তমান সরকারও চালিয়ে যাচ্ছে। খালেদার পর সামরিক নেতৃত্বে বেসামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের মধ্যকার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সর্বশেষ হাসিনা সরকারের নেতৃত্বে থাকা আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট আরো গভীরতর হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের টাকা শেষ করে ফেলেছে। সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও টাকার মানের চূড়ান্ত অবনতি ঘটানো হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের চরম

বৃদ্ধি, তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দামের বহুবার বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ জীবন বাঁচিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন। কৃষকরা ফসলের দাম খুব কম পেয়েছে। সারের দাম বেশি এবং বিদ্যুত ও তেলের দামের বারংবার বৃদ্ধির কারণে সেচকার্য চালাতে তারা খুবই কম সক্ষম। এমনকি মাঝারি কৃষকদের মধ্যে অনেকেই স্বল্প টাকায় জমি বন্ধক রাখতে চাইছেন, কিন্তু ঐ পরিমাণ টাকাও গ্রামাঞ্চলে খুব কম লোকেরই আছে, যাদের আছে তারা শহরে থাকে। গ্রামাঞ্চলে আধা-সামন্ততন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে কেন্দ্রে রেখে আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক সমাজের এক কাঠামো নির্মাণ করেছে। শ্রমিকদের ন্যুনতম প্রকৃত মজুরী নেই। কারখানায় বন্দী জীবনে হাড়ভাঙা শ্রম দিয়েও তারা পারিবারিক খরচ নির্বাহ করার তিন ভাগের একভাগ মজুরীও পান না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই শেয়ার বাজারের ভয়াল ধ্বসে সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। এই যখন অবস্থা তখন কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়া শ্রেনীর শোষণ লুণ্ঠন থেমে নেই। বরং বেড়ে চলেছে। তাদের পুঁজি ফুলে ফেঁপে উঠছে। সরকারী মন্ত্রীদের দুর্নীতি প্রকাশিত। 'পদ্মা সেতু' প্রকল্পের টাকা শুরুতেই আত্মসাৎ করে সাম্রাজ্যবাদীদেরই তারা লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। এখন মার্কিনের প্রতিনিধি ইউনুসকে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পদ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে হাসিনা শেষ রক্ষা করতে চেয়েছে। রেলমন্ত্রীর ঘুষ হাতে নাতে ধরা পড়েছে। ভারতীয় সম্প্রসারনবাদকে ট্রানজিটের নামে করিডোর দিয়ে ভারতের অনুপ্রবেশ ঘটতে দিয়ে সরকার তার দালালী কর্তব্য পালন করেছে। পক্ষান্তরে তিস্তা নদীর পানি বাংলাদেশ পায়নি। নদী নালা ধ্বংস হচ্ছে। পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানীসমূহের হাতে সোপর্দ করার অংশ হিসেবে সরকার রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা গজপ্রমকে নিয়ে এসেছে। মার্কিন, ইউরোপ, চীন, জাপান, সৌদি আরব, ভারত আর রাশিয়া হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহ যারা আমাদের দেশে আধা-উপনিবেশিক শোষণ চালাচ্ছে। রাশিয়ার সাথে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ চুক্তি আর কিছু নয় পরিবেশ ধ্বংসের পায়তারা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশে প্রধান সাম্রাজ্যবাদ যে আমাদের দেশে আধা-উপনিবেশিক শোষণ পরিচালনা করছে। সৌদি আরব এদেশে ইসলামী মৌলবাদের ও ধর্মীয় সামন্তবাদের প্রধান আর্থিক মদদদাতা। চীন এদেশে তার পন্যসামগ্রীর এক বিরাট বাজার গড়ে তুলেছে। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ আমাদের দেশের জনগণের একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব। মাদক থেকে শুরু করে তার সকল পন্য সামগ্রীর বাজার এদেশ। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ নিয়মিত সীমান্তে বাংলাদেশী জনগণের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে। সম্প্রতি দেশি বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা এক ফ্যাসিবাদী গোপন বাহিনী গঠন করেছে যা বিরোধীদের গুম করছে। বাংলাদেশে শুরু থেকেই আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এক সাধারণ সংকটে রয়েছে যা ক্রমান্বয়ে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। ফ্যাসিবাদ এই সংকট থেকে পরিত্রাণের আশায় বিকল্প তুলে ধরার ভাণ করে যা সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশিল, এটা বিপবী ও জনগণের জন্য ভয়াবহতম শোষণ ও শাসনের পাশাপাশি নিজ শ্রেণীর বিরোধী গোষ্ঠীগুলির ওপরও একনায়কত্ব কায়েম করে। বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের উদাহারণ হচ্ছে মুজিববাদ, জিয়া-এরশাদ-তত্ত্বাবধায়ক সামরিক স্বৈরাচার, খালেদা-হাসিনার 'গনতান্ত্রিক' স্বৈরাচার, ধর্মীয় মৌলবাদ প্রভৃতি। এরা 'সোনার বাংলা', 'খাল কাটার কর্মসূচি', 'নতুন বাংলা', 'দুর্নীতি বিরুদ্ধে সংগ্রাম', 'ইসলাম' প্রভৃতির নামে জনগণকে প্রতারিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। এরা রক্ষী বাহিনী, র‍্যাব, গুম করার বাহিনীর মাধ্যমে বিপবী, জনগণ, এমনকি নিজ শ্রেণীর বিরোধী গোষ্ঠীগুলির ওপর নির্মম নিপীড়ন চালিয়েছে আর অব্যাহতভাবে চালাচ্ছে।

আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধাঔপনিবেশিক সমাজের ভিতের ওপর গড়ে ওঠা আদ্যপান্ত পঁচে যাওয়া আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও দালাল বুর্জোয়া শ্রেণী ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক বড় ধনী শ্রেণীকে বাঁচানোর চেষ্টা সামরিক অথবা বেসামরিক কোন স্বৈরাচারী শাসনের দ্বারাই সম্ভব হয়নি। এ চেষ্টা কখনোই সফল হবেনা। যা পঁচনশীল তা কেবল আরো পঁচে যাবে, আর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে।

সাম্রাজ্যবাদ কেন সামন্তবাদকে পুরোপুরি ক্ষয় করতে পারে না

নয়াগণতান্ত্রিক বিপবের অর্থ হলো সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপব। এর অর্থ হচ্ছে আজকের পৃথিবীতে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এই বিপবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম নয়। এই বিপব সামন্তবাদের উৎখাতের সাথে সম্পর্কিত। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী অতি দুর্বল ও দোদুল্যমান হওয়ার কারণে সে আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে জড়িয়ে থাকে, তাকে আলাদা করা যায় না। সুতরাং সে সামন্তবাদকে উৎখাত করতে সক্ষম নয়। বিপবী সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণী নেতৃত্ব দিলেই সে দালাল বুর্জোয়াদের থেকে পৃথক হয়ে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন ফ্রন্টে যোগ দেয়। সর্বহারা শ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে শর্তাধীনে ফ্রন্টে নেয়।

সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক একটি দেশের গণতান্ত্রিক বিপব, বিপবী পরিস্থিতি, শ্রেণীসংগ্রামের অগ্রগতি তথা বহুবিধ বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদকে ততটুকুই ক্ষয় করে যতটুকু তার প্রয়োজন। এই ক্ষয় অনিবার্য কিন্তু ধ্বংস অনিবার্য নয়। ক্ষয় হয় বলেই সামন্তবাদকে ধ্রুপদি রূপে দেখা যায় না। বরং আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও পণ্য অর্থনীতিই দৃশ্যমান। যা বজায় রয়েছে তাহলো সামন্তবাদী শোষণের পদ্ধতি।

কৃষি বিপব

কৃষি বিপব হচ্ছে নয়াগণতান্ত্রিক বিপবের অক্ষ। কৃষি বিপব পরিচালনা করেই কেবল কৃষক জনগণকে সমাবেশিত করা যায় তথা গণযুদ্ধ পরিচালনা করা যায়। এর কেন্দ্রিয় বিষয় হচ্ছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। এরাই হচ্ছেন বিপবের প্রধান শক্তি। দেশের অর্থনীতি হলো মূলতঃ কৃষি অর্থনীতি। ভূমিহীন ও গরীব কৃষকরা হচ্ছেন কৃষকের ৮০% এবং সমগ্র দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি হচ্ছেন এরাই।

আমাদের দেশে কখনোই ভূমি বিপব ঘটেনি। সামন্তবাদ অপসারণের দুই ধরণের কর্মসূচি রয়েছে--

ভূস্বামী পথ ২. কৃষক পথ

প্রথম পথটি প্রতিক্রিয়াশীল পথ। এ পথে সামন্তবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের আঁতাতের ফলে বণিক পুঁজি তথা আধা সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। ফলে সামন্তবাদ পুরো উৎখাত হয়না। বরং এই পশ্চাদপদ শোষণের পদ্ধতিকে সাম্রাজ্যবাদ কাজে লাগায়।

দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে কৃষক পথ। এই পথ বিপবী পথ। এ পথে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে ভূমিহীন ও গরীব কৃষক সামন্তবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উৎখাত ঘটায়। এই পথ সামন্তবাদকে বিপবী উপায়ে উৎখাত করে। নয়াগণতান্ত্রিক বিপব হচ্ছে এই দুই পথের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। সামন্তবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের ভিত্তি।

কৃষক পথে ভূমিহীন ও গরিব কৃষকরা শ্রেণীশত্রুর জমি ও সম্পত্তি দখল করে। ভূমিবন্টন সম্পর্কে আমাদের দেশে ধারণা হচ্ছে জমি খণ্ড খণ্ড করে প্রতিটি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকের মধ্যে বন্টন করা। সুতরাং জমি খুবই ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এই ভীতি অনেক সমালোচকের মধ্যেই বিরাজমান। আসলে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী আর

কৃষকের চেতনার মান অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড বন্টন হবে না যৌথ খামার না রাষ্ট্রীয় খামার হবে তা নির্ধারিত হবে।

ভূমি বন্টনের বিরুদ্ধে আরেকটি যুক্তি যে, দেশে জমি কম, জনসংখ্যা বেশি। কার্যতঃ দেশের মোট কৃষি জমির একাংশে পরিকল্পিত উপায়ে চাষাবাদ করে বিরাট ফলন ঘটানো সম্ভব। দেশীয় প্রাকৃতিক সার, নদী-নালা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটা সম্ভব।

কৃষি বিপবকে বাতিল করার জন্য 'বিকৃত পুঁজিবাদ'-এর প্রবক্তারা উপরিউক্ত যুক্তি দেয়। তারা আরো বলে যে শ্রেণীশত্রুর হাতে পর্যাপ্ত জমি নেই, কার কাছ থেকে জমি নেবেন। শ্রেণীশত্রুর হাতে উলেখযোগ্য জমি নামে ও বেনামে রয়েছে। কোর্ট কাচারী থানা পুলিশের সহায়তায় এরা যুগ যুগ ধরে অর্থনীতি বহির্ভূত বলপ্রয়োগ, প্রতারণা ও নানাবিধ সামন্ততান্ত্রিক-পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের প্রক্রিয়ায় গরীব ও মাঝরি কৃষকদের অধিকাংশ জমিই গ্রাস করেছে। সেসব জমি উদ্ধার করাটাও ভূমি বিপবের অংশ। 'বিকৃত পুঁজিবাদ'-তত্ত্বের প্রবক্তরা আসলে ভূমির আমূল বিপবী রূপান্তরকে বোঝে না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীসমূহ

আমাদের আর্থ-সামাজিক বিশেষণ থেকে এটা পরিষ্কার যে এখানে তীব্র শ্রেণী মেরুকরণ সংঘটিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ আধা-সর্বহারা স্তরে নেমে গেছে, যারা বিপবে সর্বহারা শ্রেণীর দৃঢ় মিত্র। নিম্ন মধ্যবিত্ত অংশটি ও মাঝারি স্তরের অংশটির তেল, গ্যাস, বিদ্যুতের বহুবার দাম বৃদ্ধি, বেকারত্ব, শেয়ার বাজারের বিপর্যয়, বাড়তি করের বোঝা এবং দ্রব্যমুল্যের ভয়াবহ বৃদ্ধিতে জীবনযাত্রার ক্রমাবনতি ঘটছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত অংশটি বিপবে সর্বহারা শ্রেণীর নিকটতম মিত্র। মাঝারি অংশটি বিপবের দোদুল্যমান মিত্র। মধ্যবিত্তের উচ্চতর অংশটি শোষকশ্রেণীর সাথে গাঁটছড়া বাঁধা। এদেরকে বিপবী সংগ্রামের অগ্রগতিতে শর্ত সাপেক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা যায়।

বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী যার কেন্দ্রে রয়েছে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ

আধা-সামন্ততন্ত্রের সাথে কৃষক জনতার দ্বন্দ্বই হলো বিপবের বর্তমান পর্যায়ে প্রধান দ্বন্দ্ব

আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণীর কেন্দ্রীয় কাঠামোর অধীন তার নীচের স্তরের আধা-সামন্ততান্ত্রিক বড় ধনী শ্রেণীর সাথে শ্রমিক-কৃষক ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বই হচ্ছে কৃষি বিপবের পর্যায়ে শ্রেণীগতভাবে প্রধান দ্বন্দ্ব

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাধীনে পূর্ববাংলার সমাজ বিকাশের ধারায় প্রতিবন্ধক হচ্ছে আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা উপনিবেশিক ব্যবস্থা যার অপসারণের মাধ্যমে নয়াগণতান্ত্রিক বিপব সমাধা হবে, যার জাতীয় ও গণতান্ত্রিক এ দুটো দিকের মধ্যে আজকে গণতান্ত্রিক দিকটি প্রধান। অর্থাৎ আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাই প্রধান সমস্যা। কিন্তু শ্রেণী হিসেবে এই ব্যবস্থাকে রক্ষা করছে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের প্রতিনিধি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণী যার রয়েছে কেন্দ্রিয় রাষ্ট্র, সংসদ, ব্যাংক, শিল্প, রাজনৈতিক দল ও সৈন্যবাহিনী। অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতায় এরা আসীন। কিন্তু শ্রেণী হিসেবে এরা স্বাধীন নয়, এরা সাম্রাজ্যবাদের দালাল। ফলে এই শ্রেণীটিকে উৎখাত করে বিপব সাধন করতে হবে যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই বিপবের কেন্দ্রিয় প্রশ্ন। সুতরাং এই শ্রেণীটির উৎখাত একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ-আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ উৎখাতের সাথে যুক্ত। কিন্তু সামন্ততন্ত্র উৎখাত ব্যতীত পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাতে আগেই যাওয়া যায়না ইতিহাসের বস্তুবাদী নিয়মানুসারে। তাই, বিপবের বর্তমান পর্বে এটি প্রধানতঃ কৃষি বিপব। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎখাতই হচ্ছে এখনকার প্রধান করণীয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে শ্রেণী হিসেবে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ার কেন্দ্রিয় কাঠামোর অধীন এখানে সামন্তবাদীরা এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় এরা বড় বুর্জোয়াদের নীচের স্তরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সুতরাং এই সামন্তবাদীরা আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের সেবা করে থাকে, কৃষকদের অতিরিক্ত উদ্বৃত্তমূল্য শোষণ করে এরা বুর্জোয়া ব্যাংকে রাখে, ব্যবসা ও শিল্পে বিনিয়োগ করে। পক্ষান্তরে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা তাদের ব্যাংক ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করে, থানা-পুলিশ কোর্ট কাচারী দিয়ে সহযোগিতা করে।

গ্রামাঞ্চলে শোষকদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যই এখন পর্যন্ত প্রধান। সামন্তবাদীরা সুদী কারবার, অর্থনীতি বহির্ভুত বলপ্রয়োগ, প্রতারণা, দুর্নীতি প্রভৃতির মাধ্যমে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করে থাকে। এছাড়া ধর্মের ব্যবহারও গ্রামাঞ্চলে অনেক শক্তিশালী। নারীদের ওপর অবরোধ আরোপ, বহু বিবাহ, তালাক, যৌতুক প্রথা ইত্যাদি খুবই শক্তিশালি। শোষিত লাঞ্ছিত এই নারীরাই আবার সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে শহরে গার্মেন্টসে যুক্ত হয়েছেন, কিন্তু সেখানেও তারা অতিরিক্ত উদ্বৃত্তমূল্য শোষনের স্বীকার। সম্পত্তিতে নারীদের সমঅধিকার স্বীকৃত না হওয়াটা সামন্ততন্ত্র শক্তিশালি হওয়াকে দেখায়। মাদ্রাসা ব্যবস্থাকে শক্তিশালি করার মাধ্যমে, ফতোয়া প্রদান বৈধ করার মাধ্যমে এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে রাষ্ট্র সামন্ততন্ত্রকে অধিকতর শক্তিশালি করেছে।

এই আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশে তার আধা উপনিবেশ কায়েম করেছে। এর অর্থ হলো যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি নিবেদিত ততক্ষণ সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনুমোদন দেয়। কিন্তু যে কোন সময় যে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে কোন অযুহাতে আমাদের দেশ দখল করে নিতে পারে, অর্থাৎ পুরোপুরি উপনিবেশে পরিণত করতে পারে। সুতরাং আধা-উপনিবেশ মূলতঃ উপনিবেশই। এটাই হলো সভাপতি সিরাজ সিকদারের ধারণা। সুতরাং আমাদের বিপবের অপর একটি দিক হলো জাতীয় বিপব। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা। একটি পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি হস্তক্ষেপ করলে জাতীয় বিপব প্রধান হবে। যখন ভূমি বিপব সংঘটিত হয় তখনো গৌনতঃ জাতীয় বিপব সংঘটিত হয়। আবার যখন জাতীয় বিপব সংঘটিত হয় তখনো ভূমি বিপব গৌণতঃ ঘটে।

আধা উপনিবেশের উপনিবেশ থাকতে পারে

দেশীয় দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সিরাজ সিকদার ৭১ পূর্ব ও ৭১ পরবর্তীতে যথাক্রমে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে জাতিয় দ্বন্দ্বকে ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্বকে উলেখ করেছিলেন। ৭১-এ ভারতীয় দখলদারিত্বের মাধ্যমে পাকিস্তানের স্থলে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। নিপীড়িত দেশগুলির মধ্যে কোনটি অপর নিপীড়িত দেশের জন্য বা নিজ দেশের অপরাপর নিপীড়িত জাতিসমূহের জন্য প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে যেতে পারে এটি সিরাজ সিকদারের একটি তত্ত্ব। অর্থাৎ আধা উপনিবেশের উপনিবেশ থাকতে পারে। এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সিরাজ সিকদারকে সংশোধনবাদের সাথে তীব্র সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। প্রথমোক্ত দেশটি আধা উপনিবেশিক হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদের অধীন, কিন্তু এর জাতীয় আমলাতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশ অন্য জাতিসমূহ বা অন্য দেশকে অধীন করে ফেলতে পারে। এটা বিপবপূর্ব রাশিয়াও দেখা গেছে। কমরেড সিরাজ সিকদারের উপনিবেশ সংক্রান্ত তত্ত্ব থেকে আনোয়ার কবীর বিচ্যুত হয়ে নয়া উপনিবেশ সূত্রায়ণ গ্রহণ করে যা আশির দশকে দ্ব্যার্থবোধকতা থেকে ছিল সমন্বয়বাদ এবং নব্বই দশকে তৃতিয় কংগ্রেসের পর থেকে পরিষ্কারভাবে সংশোধনবাদী। নয়া উপনিবেশ সংক্রান্ত তত্ত্বটি

হচ্ছে ক্রুশ্চেভীয় তত্ত্ব যা মাওবাদীরা বর্জন করে এসেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ অতি মুনাফার লোভে আমাদের গ্রহটিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। বাংলাদেশে তথাকথিত পুঁজিবাদী উন্নয়ন ব্যাপক দুষণের মাধ্যমে পরিবেশ ধ্বংস করে দিয়েছে, একদা গহীন অরণ্যের বাংলা এখন বনশুন্য প্রায়। এরা নদীগুলোকে জৈবিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। কৃত্রিমভাবে ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের উপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক বিকাশ জনগণকে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় অক্ষম করে তুলোছে। ভূগর্ভস্থ পানির বৈজ্ঞানিক অপব্যবহারের ফল হিসেবে জনগণ পেয় পানিতে আর্সেনিক দূষণ মোকাবেলা করছেন। উপনিবেশবাদ ও আধা-উপনিবেশবাদ শোষণের এক অন্ধ বিকাশের প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত করেছে এর এক মুল্য হিসেবে প্রকৃতির ভারসাম্য ধ্বংস করে।

সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শোষণ শহর ও গ্রামের মধ্যে এক মৌলিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। গ্রামগুলিকে ধ্বংস করে অপরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে শহরের তথাকথিত উন্নয়ন করা হচ্ছে। ফলে শহরে ছুটছে মানুষ। এখন দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ শহরে বাস করে যাদের গড় আয় গ্রামের মানুষের প্রায় দ্বিগুণ। বিপবের মাধ্যমে পৃথিবীকে রক্ষা করা না গেলে এর ধ্বংস ঠেকানো সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিক লাইন

বিশ শতকের সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য দুনিয়াজোড়া সংগ্রামের অনেক অনেক বাঁক পেড়িয়ে বিশ্ব যখন একুশ শতকে প্রবেশ করেছে তখন আরো পরিস্কারভাবে ফুঁটে উঠেছে কমিউনিজমের মহান লক্ষ্য, অন্য কোন কিছু নয়। ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!' ঘোষণা করার সাথে সাথে এই মহান আদর্শিক সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়, তারপর মানব জাতি প্রত্যক্ষ করেছে অপরিমেয় আত্মদান ও মহান সংগ্রামসমূহ। ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউন, ১৯১৭ সালে রুশ বিপব, ১৯৪৯ সালে চীন বিপব আর ১৯৬৬-১৯৭৬ সালের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপব ছিল সর্বহারা নেতৃত্বে এই লক্ষ্যে মহান সব বিপবসমূহ। তারপর পেরু, নেপাল, বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিপাইন, তুরস্কসহ সারা দুনিয়ায় গণযুদ্ধের নতুনসব উত্থানসমূহ আজকে বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে সেই লক্ষ্যের দিকে। কমিউনিজমের মতবাদ মার্কস কর্তৃক মার্কসবাদে. লেনিন কর্তৃক লেনিনবাদে আর মাও কর্তৃক মাওবাদে বিকশিত হয়েছে। আজকে এই মতবাদ অব্যাহতভাবেই বিকশিত হয়ে চলেছে।

মাওবাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যঃ সাম্রাজ্যবাদের আয়ু ৫০ থেকে ১০০ বছর, বিপব হচ্ছে প্রধান প্রবণতা, হয় বিপব যুদ্ধকে ঠেকাবে, নয়তো যুদ্ধ বিপবকে ডেকে আনবে। আজকের বিশ্বের বাস্তবতা এই বক্তব্যগুলোর যথার্থতা প্রমাণ করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যতই বিশ্বব্যাপী একক আধিপত্যের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, ততই নিপীড়িত জাতি ও জনগণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। প্রতিদিন সাম্রাজ্যবাদ জনগণের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে, আর জনগণ যুদ্ধের মাধ্যমে তাকে মোকাবেলা করছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করছে অপরাপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহও। সাম্রাজ্যবাদ কোনভাবেই যুদ্ধ এড়াতে পারছে না আর নিপীড়িত জনগণ বিপবী যুদ্ধের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এই হচ্ছে বাস্তবতা।

আন্তর্জাতিক লাইন একটি কমিউনিস্ট পার্টির লাইনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেননা সর্বহারা শ্রেণী হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রেণী। প্রতিটি দেশের সর্বহারা শ্রেণী হচ্ছে আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণীর এক একটা বাহিনী। চেয়ারম্যান মাও তিন বিশ্ব থিসিসের মাধ্যমে সমকালীন বিশ্বের দ্বন্দ্ব বিশেষনে এগিয়েছিলেন যাকে চীনা সংশোধনবাদীরা ধামাচাপা দিয়েছিল। চেয়ারম্যান মাও তাঁর থিসিসের ভিত্তিতে বিশ্ব বিপবের রণনীতি ও রণকৌশল প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়েছিলেন। সেই ভিত্তিতে আজকের বিশ্বের মূল দ্বন্দ্বগুলো নিম্নরূপঃ

১) সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি (এখন কেবলমাত্র মার্কিন) ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ বনাম নিপীড়িত জাতি ও জনগণের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের শাঁস নিহিত রয়েছে পরাশক্তির সাথে দ্বন্দ্বে। এর সমাধান হচ্ছে নয়াগণতান্ত্রিক বিপব।

২) সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব

ক) সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি মার্কিনের সাথে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেমন রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন, বৃটেন ও জাপান ইত্যাদির দ্বন্দ্ব

খ) ছোট সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমুহের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব

এই দ্বন্দ্ব বিশ্বে একাধিপত্যের জন্যে লুণ্ঠনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে চালিত করে যাকে সর্বহারা শ্রেণী অবশ্যই গনযুদ্ধের দ্বারা এবং চুড়ান্তত বিশ্ব গণযুদ্ধের দ্বারা বিরোধিতা করবে।

৩) বুর্জোয়া বনাম সর্বহারা শ্রেণীর দ্বন্দ্ব

এই দ্বন্দ্বের সমাধান হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপব এবং অতঃপর সাংস্কৃতিক বিপব।

সাম্রাজ্যবাদ বনাম নিপীড়িত জাতি ও জনগণের দ্বন্দ্বই হচ্ছে বিশ্বপর্যায়ে আজকে প্রধান দ্বন্দ্ব। সভাপতি সিরাজ সিকদার মাওয়ের নীতি অনুসরণ করে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকেও উলেখ করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে। কমরেড গনসালো ও পিসিপিও আশির দশকে এটা উলেখ করেছিলো, বর্তমানে এর অস্তিত্ব নেই।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অস্তিত্ব এখন না থাকায় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের সাথে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব এখন অস্তিত্বমান নয়। দেশীয় দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সিরাজ সিকদার ৭১ পূর্ব সময়কালে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে জাতিয় দ্বন্দ্বকে প্রধান বলেছিলেন এবং ৭১ পরবর্তীতে উলেখ করেছিলেন যে ভারতীয় দখলদারিত্বের মাধ্যমে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। নিপীড়িত দেশগুলির মধ্যে কোনটি নিজ দেশের কোন জাতির অথবা অপর নিপীড়িত দেশের জন্য প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে যেতে পারে এটি সিরাজ সিকদারের একটি তত্ত্ব। অর্থাৎ আধা উপনিবেশের উপনিবেশ থাকতে পারে। এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সিরাজ সিকদারকে সংশোধনবাদের সাথে তীব্র সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। প্রথমোক্ত দেশটি আধা উপনিবেশিক হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদের অধীন, কিন্তু এর জাতীয় আমলাতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশ নিজ দেশের নিপীড়িত কোন জাতিকে অথাব অন্য দেশকে অধীন করে ফেলতে পারে। এটা বিপবপূর্ব রাশিয়াও দেখা গেছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা হচ্ছে কাগুজে বাঘ। কমিউনিস্টদের কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস অবিসংবাদী সত্য।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে দুটি স্রোত কার্যকর রয়েছেঃ আন্তর্জাতিক সর্বহারা আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। প্রথমটি নেতৃত্ব করে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভিত্তি।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা বিশ্ব বিপ-বের ঝটিকা কেন্দ্র।

মাও তিন বিশ্বের পৃথকীকরণ করে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলিকে প্রথম বিশ্ব, সাম্রাজ্যবাদী ছোট শক্তিসমূহকে দ্বিতীয় বিশ্ব আর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত দেশগুলিকে তৃতিয় বিশ্ব অর্থাৎ পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল হিসেবে চি! হৃত করেন। মাওয়ের এই বিশেষণকে বিকৃত করে দেং শ্রেণী সমন্বয়বাদী সংশোধনবাদী

তিন বিশ্ব তত্ত্ব প্রদান করে যা প্রতিক্রিয়াশীল। মার্কসবাদকে জন্ম থেকেই সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রুঁধো ও নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ড্যুরিংয়ের সৃজনশীল বিকাশের নামে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে এবং জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে উদ্ভূত সুবিধাবাদী অবস্থানসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। লেনিনকে বার্ণস্তাইন ও কাউৎস্কির সৃষ্ট পুরোনো সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে, নয়া কান্টবাদের ভাববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। লেনিনের ধারাবাহিকতায় স্তালিন ত্রৎস্কি, জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে ১৩ বছর সংগ্রাম চালান। ১৯৩৭ সালে এর উপসংহার হয়। বিষয়টি প্রশাসনিকভাবে মীমাংসিত হয়েছে এটা সত্য নয়। কমরেড মাও দেখিয়েছেন কমরেড স্তালিনের ঐতিহ্যের শতকরা ৭০ ভাগ ছিল সঠিক। কমরেড স্তালিন দ্বন্দ্ববাদসহ বিভিন্ন প্রশ্নে যে ভুল করেছিলেন তা ছিল একজন মহান কমরেডের ভুল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের, ইতালী-ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে সংশোধনবাদীদের ভূমিকাসমেত কমরেড স্তালিনের ভুমিকার পর্যাপ্ত বিশেষণ আজকে কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দিমিত্রভের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল একচেটিয়া পুঁজিবাদের সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল অংশ হিসেবে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদ বিরোধী বুর্জোয়াদেরকে নিয়ে পপুলার ফ্রন্টের যে তত্ত্ব দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে দূর্বলতা ছিল। এ দুর্বলতা হচ্ছে এতে কমিউনিস্ট পার্টি ও সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বের গ্যারান্টি ছিলনা, ফলে সেই সুযোগে ইউরোপ, ভারতসহ সারা দুনিয়ায় কমিউনিস্টদের হাত থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব বুর্জোয়ারা করায়ত্ত করে ফেলে। জার্মানী ও ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি এমনকি সাম্প্রদায়িক শ্রেণীদ্বন্দ্বের অস্তিত্ব পর্যন্ত আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে যা জার্মানীতে ফ্যাসিবাদীদের জন্য আর ভারতে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল। চেয়ারম্যান মাও নয়া গণতন্ত্রের তত্ত্বের মাধ্যমে এর তাত্ত্বিক সমাধান করেছিলেন যেখানে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বের গ্যারান্টি রয়েছে, যেখানে অব্যাহত বিপবের কথা বলা হয়েছে, যেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপব বিশ্ব সর্বহারা বিপবের অংশ এবং অব্যাহতভাবে তা সমাজতন্ত্রে ও তৎপরবর্তীতে সাম্যবাদী সমাজের দিকে এগিয়ে চলে।

লিউ শাউচি, তেংসহ চীনের অভ্যন্তরের সংশোধনবাদীদের মোকাবেলা করার পাশাপাশি চেয়ারম্যান মাও নেতৃত্ব দেন আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদ মোকাবেলা ও পরাজিতকরণে। ক্রুশ্চভ মার্কসবাদী আন্দোলনে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী শান্তিপূর্ণ পথ, বিপবের বদলে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ এবং সাম্রাজ্যবাদের সাথে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার তত্ত্ব উত্থাপন করেছিল। চেয়ারম্যান মাওয়ের মৃত্যুর পর সংশোধনবাদীরা চীনের ক্ষমতা করায়ত্ত করার পর মাওয়ের তিন বিশ্ব সংক্রান্ত তত্ত্বকে বিকৃত করে শ্রেণী সহযোগিতার এক সংশোধনবাদী থিসিস হাজির করে যাতে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের মতোই নিজ দেশের দালাল বুর্জোয়াদের সাথে সহযোগিতা এবং এক সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে অপর সাম্রাজ্যবাদীর সাথে ঐক্যের কথা বলে। একে মাওপন্থীরা আন্তর্জাতিকভাবে মোকাবেলা করেছেন। আনোয়ার হোজা নয়া ট্রটস্কিবাদে অধঃপতিত হয়ে মাওসেতুঙ চিন্তাধারার ওপর এক সার্বিক আক্রমণ পরিচালনা করে যাকে মাওপন্থীদের আন্তর্জাতিকভাবে মোকাবেলা করতে হয়েছে। আমাদের দেশে জিয়াউদ্দিন পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিকে হোজার সংশোধনবাদের ভিত্তিতে বিভক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এছাড়া সর্বহারা পার্টির বাইরে আব্দুল হক ছিল আরেক হোজাপন্থী। মাও মৃত্যু পরবর্তীতে চীনের সংশোধনবাদের রূপান্তরের পর সংকটজনক পরিস্থিতিতে মাওপন্থীরা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ন হচ্ছে পেরুর কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক মাওবাদ সূত্রায়ন। ৮৪ সালে এক নয়া কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের লক্ষ্যে বিপবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব একটি গুরুত্বপূর্ন অগ্রপদক্ষেপ হলেও আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে পূবাসপাসহ রিম পিসিপির অগ্রসর মতবাদ গ্রহণ না করে মাও চিন্তাধারা সূত্রায়ণে আটকে থাকে। মাওবাদ প্রতিষ্ঠায় রিমের মধ্যে পিসিপির দীর্ঘ সংগ্রাম এবং পেরুতে গণযুদ্ধের বিকাশের ফল হিসেবে ১৯৯২ সালে রিম কর্তৃক মাওবাদ গৃহীত হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠা থেকেই রিমের বিশেষতঃ এর কমিটির ভেতর এভাকিয়ানের একাধিপত্যবাদ বিরোধি সংগ্রাম চালাতে হয়েছে অনেক পার্টিকেই। ৯৬ সালে নেপালে গণযুদ্ধ সূচিত হলে রিম কমিটির মারফত এর ওপর এভাকিয়ানবাদের প্রভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে। নেপালের গণযুদ্ধ শতকরা আশিভাগ এলাকা দখল করার পরেও নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) প্রচণ্ডের নেতৃত্বে সংশোধনবাদীতে পরিণত হয়। এভাকিয়ান ইতিমধ্যেই তার মার্কসবাদ বিরোধি মতবাদ হাজির করেছে। এভাকিয়ান ও প্রচণ্ড উভয়েই মার্কসবাদ বর্জন করে যা সৃষ্টি করে তা হচ্ছে এভাকিয়ানবাদ ও প্রচণ্ডবাদ। রিমের কমিটির নেতৃত্ব দখল করে এরা রিমের বিলোপ ঘটানোয় নেতৃত্ব দিয়েছে। কমিউনিস্টদের নিজেদের সারির মধ্য থেকে এভাকিয়ানবাদী ও প্রচণ্ডবাদীরা মাওবাদী নীতিসমূহকে বিরোধিতা শুরু করে। এরা সবাই তাদের সমালোচনা কেন্দ্রীভূত করে 'চিন্তাধারা'র ওপর। এর মাধ্যমে তারা বলতে চাইছেন–বিপব প্রধান প্রবণতা নয়, বিপবী পরিস্থিতি ততটা পরিপক্ক নয়, আর সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধকে এড়াতে পারে। যেহেতু মাওচিন্তাধারা থেকে উক্ত মূলনীতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছিল, আর আন্তর্জাতিকভাবে গনসালো চিন্তাধারার মাধ্যমে এসব পুনপ্রতিষ্ঠিত হয় তাই আন্তর্জাতিকভাবে বিরোধিতা কেন্দ্রিভূত হয়েছে গনসালো চিন্তাধারার ওপর। আমাদের দেশে এই আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে এদেশের বিপবের শিক্ষা সিরাজ সিকদার চিন্তাধারার ওপর। এসব বিরোধিতা বিপব সংঘটিত করার ক্ষেত্রেই কেবল বাঁধা সৃষ্টি করে,আর কিছু নয়।

নিজেদের সারির ভেতর দুই ভাবে এই বিরোধিতা সংঘটিত হয়েছে––১। মার্কসবাদী দর্শনের ওপর আক্রমণ ২। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ওপর আক্রমণ। প্রথম পন্থায় মার্কসবাদী দর্শনের ওপর দৃঢ় না থাকতে বলা হচ্ছে একে রাজনৈতিক সত্য নাম দিয়ে। এরা এক অ-রাজনৈতিক সত্য আবিস্কার করতে চেয়েছে। তাই, তারা মহান নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখার পক্ষপাতী নন, যেহেতু তা রাজনৈতিক সত্য। এর বিপরীতে তাদের সত্য হচ্ছে মহান নেতৃত্বকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা। এর মাধ্যমে এরা প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের মহান লক্ষ্যের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করে চলেছেন। আমরা মহান নেতৃত্বকে রক্ষার পাশাপাশি ভাববাদী মহান নেতৃত্ব তত্ত্বকে বিরোধিতা করি যা বলতে চায় বড় নেতারা ভুল ভ্রান্তির উর্ধ্বে। দ্বিতীয় পন্থায়, একুশ শতকের গণতন্ত্রের নামে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ওপর সমালোচনা শুরু হয়। সর্বহারার নেতৃত্ব ও একনায়কত্বের বিরোধিতার মাধ্যমে এটাও প্রথমটির মতোই অব্যাহত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সিরাজ সিকদার, চারু মজুমদার, গনসালো, ইব্রাহীম কাপাক্কায়াসহ মাওবাদের প্রবক্তারা যখন মাও চিন্তাধারা গ্রহণ করেছিলেন তখন চিন্তাধারা প্রশ্নে তাদের কোন অস্পষ্টতা ছিল না। এরা সবাই এক একটা দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে চেয়েছেন। অনেকটা সফলতাও পেয়েছিলেন, যার ওপর আমরা দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশে সিরাজ সিকদার-মৃত্যু পরবর্তীতে মাওবাদীদের একটি

বিরাট অংশ মাও চিন্তাধারা, সিরাজ সিকদার চিন্তাধারা বর্জন করে হোজাবাদ, তেঙপন্থা ইত্যাদি সংশোধনবাদী মতধারা গ্রহণ করেছিল। সেসময় যারা সিরাজ সিকদার চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে পূবাসপাকে রক্ষা করেছিলেন, তাদেরই অনেকে আবার নব্বই দশক থেকে পথ বিভ্রান্তিতে পড়েন। এরা ১। পথ, মত, চিন্তাধারাকে বর্জনের ধারায় প্রবাহিত হন ২। সশস্ত্র সংগ্রামকে কার্যতঃ বর্জন করেন নতুবা তাকে নির্জীব করে ফেলেন। এদের নিজেদেরকে মাওবাদী বলার আগে মাও চিন্তাধারাটা (যা তারা দুই যুগেরও বেশী বলেছেন) আবার ভাল করে বুঝে নিতে হবে। তাদের উচিত হচ্ছে মাওবাদকে মূল সারে গ্রহণ করা।

প্রচণ্ডবাদীদের কর্তৃক একুশ শতকে পুরনো ধরণের গণতান্ত্রিক বিপবের যে লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে তা খুবই ভ্রান্ত। আর সেই সাথে তুলে ধরা হয়েছে অতীব ভ্রান্ত পুরোনো বহু পূর্বে বর্জিত সংসদীয় পন্থা। শান্তিবাদের পতাকার তলে এসব ধারণা শ্রেণীগত আপোষের রাজনীতির মডেলে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ শ্রেণীর গণতন্ত্র? কোন্ শ্রেণীর বিরুদ্ধে?

শ্রেণীগত প্রশ্নটিকে ঝাপসা করে দেওয়ার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সর্বহারা একনায়কত্বকে বর্জন করা হয়েছে। আর এর মূল রয়েছে মতাদর্শিক প্রশ্নে বিচ্যুতিতে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতিবাচক অভিজ্ঞতাকে নেতিকরন করা হচ্ছে। বিশ্বায়ন তথা একমেরুক সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিশেষন দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যকার বিপরীত মেরুর দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ও বিপবের অনিবার্যতা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। বিপবে মহান নেতৃত্বের ভূমিকাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হয়েছে। মালেমার মূল নীতিসমূহের প্রতি দৃঢ় না থাকার নসিহত করা হয়েছে।

এসবের বিপরীতে আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, একুশ শতকে কমিউনিজমই একমাত্র লক্ষ্য। সাম্রাজ্যবাদ ক্ষয়িষ্ণু ও মৃত্যুপথযাত্রী––অনিবার্যভাবে তা যুদ্ধ ও বিপবকে ডেকে আনছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ ও চিন্তাধারার প্রতি আমরা অনুগত আছি ও থাকবো। এভাকিয়ান যখন সমাজতন্ত্রের পতন দেখতে পান, প্রচন্ড যখন সমাজতন্ত্র ব্যর্থ ঘোষণা দেন তখন আমরা বিশ্ব কমিউনিস্টরা মার্কসবাদের সর্বশক্তিমান তত্ত্বের প্রতি অনুগত থেকে সমাজতন্ত্রের নয় মুমূর্ষু পুঁজিবাদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখতে পাই, তাই আমরা বলি সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়নি, বরং সে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এভাকিয়ান ও প্রচণ্ড মার্কসবাদের যে নেতিকরণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে তারই পরিণতিতে তাদের পরিপূর্ণ অধঃপতনের ষোল কলা পূর্ণ হয়েছে। ঐসব নেতিকরণ আমাদের দেশেও আনোয়ার কবীর, সুলতান ও মতিনের লাইনের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে মার্কসবাদের ওপর সন্দেহ সৃষ্টি করা, মহান নেতৃত্বের ওপর সন্দেহ সৃষ্টি করা, গণযুদ্ধের ওপর সন্দেহ সৃষ্টি করা আর কমিউনিজমের মহান লক্ষ্যের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করা। মার্কসবাদের পুরোনো বুর্জোয়া সমালোচকদের গলার সাথে তারা তাদের গলা মিলিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে, অনেকের মধ্যে প্রয়োগবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ লাইনের চেয়ে অস্থায়ী সামর্থকে বড় করে দেখার প্রবণতা। সিরিয়াসনেসটা এখানে মতাদর্শগত নয়, আপেক্ষিক দলভারীগত। মতাদর্শ এখানে মানদন্ড নয়। মতাদর্শ মানদন্ড হলে সংখ্যা কম হলেও সেটা সলিড। সংখ্যা কম থাকলে, সংগঠন দুর্বল থাকলে সেটা কোন অসুবিধা নয়। ধৈর্য ধরতে হবে। কিন্তু যেটা নিশ্চিত করতে হবে তা হল যা কিছু গড়ে ওঠবে তা যেন মতাদর্শিকভাবে গড়ে ওঠে। যারা অস্থায়ী সামর্থকে বড় করে দেখে তাদের অনেকেই দেং এর অনুসারি ছিলেন। এখনো তার প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কমপোসা এই স্থুল প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে এগিয়ে যেতে পারেনি, পারেনি দক্ষিণ এশিয়ায় মতাদর্শিকভাবে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে, বরং সংশোধনবাদীদের সাথে ঐক্যের মাধ্যমে নিজেকে বিলুপ্ত করেছে। আমরা নিশ্চিতভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী ঘাঁটি এলাকা চাই না, আমরা চাই সর্বহারা শ্রেণীর লাল ঘাঁটি। সেক্ষেত্রে সর্বহারা শ্রেণীর মতাদর্শ ধারণ করবো, নাকি বুর্জোয়া শ্রেণীর মতাদর্শ ধারণ করবো, সেটা প্রথম প্রশ্ন।

কমপোসার সাম্প্রতিক সুবিধাবাদী অবস্থানকে এখান থেকেই দেখতে হবে। কমপোসা প্রচণ্ডবাদের অবশেষের সাথে লজ্জাজনক আপোষ করেছে।

ইউরোপ আমেরিকার একসারি সুবিধাবাদী পার্টিকে দেখা গেছে প্রচণ্ডবাদের ধ্বজা উড়াতে। এখন এড়া তথাকথিত প্রচণ্ডবাদের অবশেষের ধ্বজা উড়িয়ে চি! হুত হয়ে ভারতের গণযুদ্ধের আড়ালে নিজেদের লুকাতে চাইছে। এইসব মধ্যপন্থী-সুবিধাবাদীদের নেতৃত্বে রয়েছে পিসিএম ইতালী। পিসিএম ইতালী মধ্যপন্থা ও সুবিধাবাদের ভিত্তিতে এক নয়া রিম প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে ও সেলক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পিসিএম ইতালীর মধ্যপন্থা ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের প্রকৃত মাওবাদী শক্তি সংগ্রাম চালিয়েছে। দুনিয়ার অপরাপর মালেমা শক্তিগুলোও একই সংগ্রাম চালিয়েছে। এবং এটাই আন্তর্জাতিক এমএলএম শক্তিগুলির ঐক্যের সোপান রচনা করেছে। মধ্যপন্থা ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে ২৬ ডিসেম্বর ২০১১ পেরু, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, ইকোয়েডর, পানামা, ফ্রান্স, স্পেন, আরব ও বাংলাদেশের ৯ মালেমা পার্টির এবং ১ মে ২০১২ আমাদের পার্টিসহ পানামা, কলম্বিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের আন্তর্জাতিক বিবৃতিতে অত্যন্ত জোরালোভাবে মধ্যপন্থা-সুবিধাবাদকে উন্মোচনা করার মাধ্যমে একে সংগ্রাম করা হয়েছে। আশা করা যায় অর্জিত এই ঐক্য একটি প্রকৃত মাওবাদী আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার দিকে আরো এগিয়ে যাবে।

সারা দুনিয়ার কমিউনিস্ট শক্তি ঐক্যবদ্ধ হবেই। দুনিয়ার সর্বহারা ও নিপীড়িত জাতিসমুহ এক হও!!

সামরিক লাইন

মহান কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সর্বপ্রথম তুলে ধরেন সর্বহারা শ্রেণীর সশস্ত্র বিপবের ধারণা, তাঁদের জীবদ্দশায় প্যারি কমিউনে সর্বহারা শ্রেণী প্রথম রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল যেখান থেকে সর্বহারা একনায়কত্বের মার্কসবাদী ধারণা বিকশিত হয়। লেনিনকে রাশিয়ায় বিপবের আগে তিন মাসের মধ্যে বাহিনী গড়ে তুলতে হয়েছিল। অক্টোবর বিপবের পর দীর্ঘ চার বছর তাদেরকে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছে। এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চীনে কমরেড মাও চীনের বাস্তবতায় দীর্ঘ মেয়াদী চব্বিশ বছর গণযুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে চীন বিপব জয়যুক্ত হয়। চেয়ারম্যান মাওয়ের মাধ্যমেই সর্বহারা শ্রেণী একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক লাইন গড়তে পেরেছে। একথাটি বলেন পেরুর কমরেড গনসালো। গনসালো বলেন গণযুদ্ধ হচ্ছে সার্বজনীন। অর্থাৎ গণযুদ্ধ শুধুমাত্র নিপীড়িত দেশগুলিতেই নয়, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেও প্রযোজ্য। আমাদের মত দেশগুলিতে গ্রামাঞ্চলে গণযুদ্ধের পাশাপাশি পরিপূরক হিসেবে শহরেও গণযুদ্ধ সম্ভব। যদিও শহরে গ্রামের মতো ঘাঁটি গড়ে ওঠবেনা কিন্তু সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠবে, পেরু, ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশে সিরাজ সিকদারের সময়কালের সশস্ত্র হরতালসহ শহরে সশস্ত্র তৎপরতা এই তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণ করে।

সামরিক লাইন হচ্ছে রাজনৈতিক লাইনের কেন্দ্র। কমরেড সিরাজ সিকদার পূর্ববাংলায় মাওবাদের প্রয়োগের মাধ্যমে এক সামরিক লাইন প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বহারা শ্রেণীর একটি সামরিক লাইন থাকতে হবে, এটা তিনি উপলব্ধি করেন, আর এটা হচ্ছে গণযুদ্ধ। তাঁর নেতৃত্বে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি বিপবী অনুশীলনের মাধ্যমে সামরিক ক্ষেত্রে বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, চিন্তা বিকশিত করেছে যা তাঁর নেতৃত্বে পার্টি কর্তৃক বিবৃত হয়েছেঃ

"জনগণের সেনাবাহিনী ব্যতিত জনগণের কিছু নেই", রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্দুকের নলের মধ্য দিয়েই জন্মলাভ করে", "সশস্ত্রসংগ্রাম হচ্ছে বিপ-বের সর্বোচ্চ রূপ", "সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পার্টির বিকাশ, সুসংবদ্ধতা ও বলশেভীকিকরণ সম্ভব", "সশস্ত্র বাহিনী হচ্ছে পার্টির অধীন প্রধান ধরণের গণসংগঠন" ।..."গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমেই জনগণকে জাগরিত, সংগঠিত ও জনগণের শক্তিকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়।"

কমরেড সিরাজ সিকদারের সামরিক লাইনটির উৎস তাঁর রাজনৈতিক লাইন যা আবার এসেছে তাঁর মতাদর্শিক লাইন থেকে । মাও সেতুঙ চিন্তাধারাকে মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করায় তিনি সর্বদাই মতাদর্শিক পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও হক-তোহারা মাওচিন্তাধারা প্রশ্নে তথা মতাদর্শিক প্রশ্নে দৃঢ় না থাকায় চেবাদী সামরিক লাইন অনুসরণ করেছে। মতাদর্শিকভাবে মাওবাদী গনযুদ্ধের লাইন গ্রহন করার কারণেই কমরেড সিরাজ সিকদার সক্ষম হয়েছিলেন দুইবার ঘাঁটি এলাকা বিনির্মানে এবং দেশব্যাপী শক্তিশালি সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলতে। তাঁর নেতৃত্বে পার্টি এক নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। চেয়ারম্যান গনসালো পরবর্তীতে যে বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করেছেন সেই সশস্ত্র জনগণের সমুদ্র তথা মিলিশিয়া গড়ে তোলার প্রচেষ্টা থাকার কারণে সামরিক লাইনে এ গণযুদ্ধ ব্যাপক জনগণের সমর্থন লাভ করতে পেরেছে। গনসালো গণযুদ্ধ গড়ে তোলার আগে পার্টির সামরিকীকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। পূবাসপা প্রথম থেকেই সামরিকীকৃত ছিল।

পূবাসপা সশস্ত্র সংগ্রাম সূচিত করে সাম্রাজ্যবাদী ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর বোমাবর্ষনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে কমরেড চারু মজুমদারের "খতম লাইন"-এর প্রভাবে পূবাসপাও জাতীয় শত্রু খতম অভিযান চালিয়েছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত "বাছাইকৃত" হিসেবে।

সমালোচকরা শ্রেণীশত্রু খতম নিয়ে প্রশ্ন তুলে থাকেন।

কমরেড চারু মজুমদার শ্রেণী শত্রুর রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব ধ্বংস করার একটি উপায় হিসেবে শ্রেণী শত্রু খতম লাইনটিকে দেখেছেন। তার কাছে এটা ছিল একটা যুদ্ধ। কমিউনিস্টরা কখনো দৈহিকভাবে নিধনের পক্ষপাতী ছিলেন না, এখনো নন। যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় শ্রেণীশত্রু নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে।

অবশ্যই বিপবীরা আগের মতো শ্রেণীশত্রু খতমের অভিযান চালিয়ে এখন কোথাও বিপবী যুদ্ধ গড়ে তুলবেন না। কেননা সময়ের পরিবর্তনে অনেক রক্ত দিয়ে বিপবীরা শিখেছেন কিভাবে যুদ্ধ আরো সুসংহতভাবে, আরো কম রক্তপাতের মধ্যদিয়ে, আরো নিয়ন্ত্রিতভাবে চালানো যায়। সভাপতি সিরাজ সিকদার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সৃজনশীলভাবে অধিকতর নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, খতম কমানোর কথা বলেছেন। পরবর্তীতে কমরেড গনসালোর নেতৃত্বে পেরুর গণযুদ্ধ আরো পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে গণযুদ্ধের সামগ্রিকতা, শ্রেণীশত্রুর রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বকে কীভাবে যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করা যায়। পেরুর অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে খতম হচ্ছে যুদ্ধের মধ্যেই একটা সামরিক এ্যাকশন, এবং তা অবশ্যই হতে হবে 'বাছাইকৃত'।

কমরেড সিরাজ সিকদারের সামরিক লাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল শত্রুর ওপর অতর্কিত আক্রমণ হানা–যা গেরিলাযুদ্ধের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। তিনি বর্ষাকালকে রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখেছেন বাংলাদেশের ভৌগোলিকতাকে বিচার বিশেষণ করে। তিনি বর্ষাকালীন রণনৈতিক আক্রমণের সামরিক পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন যা মাওবাদী সামরিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশের ভৌগিলিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার এবং সেই ভিত্তিতে রননৈতিক ও রণকৌশলগত পরিকল্পনা রচনা মাওবাদী গণযুদ্ধ গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। প্রথমে সভাপতি পাহাড় ও জঙ্গলাকীণ এলাকাকে গেরিলা ঘাঁটি গড়ে তোলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখেছেন। সেঅনুসারে সর্বহারা পার্টি পেয়ারাবাগানে ৭১ সালে এবং পার্বত্য চট্রগামে ৭২-৭৫-এ মুক্ত এলাকা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল যাকে পরবর্তীতে কমরেড সিরাজ সিকদার বলেছেন "স্বাভাবিক ঘাঁটি"। কমরেড সিরাজ সিকদারের সর্বশেষ সারসংকলন অনুসারে পূর্ববাংলার ঘাঁটি এলাকা গঠনের সমস্যা হচ্ছে সমভূমিতে ঘাঁটি এলাকা গঠনের সমস্যা। এটা হচ্ছে সাধারণ সমস্যা। অপরদিকে পাহাড়, জঙ্গল, চরাঞ্চলসহ দুর্গম অঞ্চলগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান পার্টি অব্যাহত রাখে।

কমরেড সিরাজ সিকদার-পরবর্তী নেতৃত্ব সমন্বয়বাদ দ্বারা পরিচালিত হয় আশির দশকে। আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে একদিকে কমরেড সিরাজ সিকদারের লাইন অপরদিকে তার নিজস্ব লাইন--এই দুই লাইনের সমন্বয় ঘটানো হয় যা কমরেড সিরাজ সিকদারের গ্রামাঞ্চল ভিত্তিক কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে শহরাঞ্চলেও সশস্ত্র তৎপরতা চালানোর লাইন থেকে সরে গিয়ে গ্রামে পার্টি আর শহরে গণসংগঠন---এই লাইনে চালিত হয়। কমরেড সিরাজ সিকদার যখন বলেন পূর্ববাংলায় অর্থনীতি দেশব্যাপী সমবিকশিত তখন এর দ্বারা তিনি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের আধিপত্যকেই বোঝান। তাই তিনি গ্রাম ও শহরের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালান। এবং পার্টির কাজের অংশ হিসেবে পার্টি সৃষ্ট গণসংগঠনের কথা বলেন। আজকে সভাপতি গনসালো ও পিসিপির মাধ্যমে বিষয়গুলো পুরোপুরি পরিষ্কার হয়েছে যা আগে ততটা মূর্ত ছিলনা। সভাপতি সিরাজ সিকদারের শহীদ হওয়ার পর শেখ মুজিবের পতন ঘটলে মার্কিনের দালাল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করে। সাম্রাজ্যবাদ প্রধান দ্বন্দ্ব এই মূল্যায়ন আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে গ্রহন করা হয়। উপনিবেশ সংক্রান্ত তত্ত্ব থেকে নয়া উপনিবেশ সংক্রান্ত সংশোধনবাদী বিচ্যুতির পথ গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক লাইনে এই বিচ্যুতি এবং নিজ সংস্কারবাদী খতম লাইনের মতাদর্শিক বিচ্যুতির কারণে সামরিক লাইন এক সশস্ত্র সংস্কারবাদী লাইনে পরিণত হয়, তাঁরই পরিণতিতে নব্বই দশকে পুরোপুরি সিরাজ সিকদারের লাইন বর্জনের মাধ্যমে পার্টি পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরা দাবী করেন, এরা সিরাজ সিকদারের গেরিলা যুদ্ধের লাইনকে নিজেদের লাইন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তা কি স্বাক্ষ্য বহন করে? মহান সিরাজ সিকদারের কাছ থেকে মাওবাদকে এরা গ্রহণ করেন না মূল আদর্শ হিসেবে। ফলে সিরাজ সিকদারের কাছে যা ছিল গণযুদ্ধ তা তাদের কাছে হয়েছে গেরিলা যুদ্ধ। এইভাবে মাওবাদ থেকে এরা বিচ্যুত হয়েছেন। এরা কৃষি বিপবকে অক্ষ মনে করেনা বরং অক্ষ মনে করে সশস্ত্র তৎপরতাকে, তাই এরা জনগণের ক্ষমতার সংস্থা গণকমিটি গঠন করেনা। তাই স্বাভাবিকভাবে এরা সমরবাদে অধঃপতিত হয়, জনগনের মাথার ওপর চেপে বসে আমলাতান্ত্রিকে পরিণত হয়। তাই, সিরাজ সিকদার পরবর্তী অন্যতম নেতা মতিন নব্বই দশকে এসে মতাদর্শের নির্ধারকত্ব বাতিল করে

সহিংসতাকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে নিয়ে আসে।

সভাপতি সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর আনোয়ার কবীর সিরাজ সিকদার-এর ঘাঁটি এলাকার লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে তথাকথিত এলাকা আঁকড়ে ধরার লাইন গ্রহণ করে। খতমকে স্তর হিসেবে চিি! ! ! ! হুত করে তিন স্তর বিশিষ্ট এক সশস্ত্র সংস্কারবাদী লাইন গ্রহণ করা হয় যার প্রথম স্তর ছিল খতম স্তর, দ্বিতীয় স্তর ছিল গণসংগ্রামের স্তর এবং তৃতীয় স্তর ছিল গেরিলা যুদ্ধের স্তর। সিরাজ সিকদারের দেশব্যাপী গণযুদ্ধের লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে কতিপয় অঞ্চলভিত্তিক গ্রামে পার্টি আর শহরে গণসংগঠনের লাইন গ্রহন করে। নব্বই দশকে এরা সিরাজ সিকদারের লাইন পুরোপুরি বর্জন করে পার্টিকে ধ্বংসের দিকে চালিত করে। এরা কিছুদিন ভ্রাম্যমান গেরিলাবাদী তৎপরতা চালিয়ে বিলোপের দিকে এগিয়েছে।

সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টির সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা হচ্ছে গণযুদ্ধ গড়ে তোলার জন্য আমাদের গাইড। সিরাজ সিকাদরের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারিঃ

আমাদেরকে গ্রামে গিয়ে গরীব কৃষককে কৃষির বিপবী যুদ্ধে উৎসাহিত করতে হবে। একে অক্ষ ধরে প্রধানতঃ গরীব কৃষকদের মধ্য থেকে বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। বাহিনী প্রথমে অনিয়মিত চরিত্রর হবে। তারপর অনিয়মিত বাহিনী থেকে নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি সশস্ত্র জনগণের সমুদ্র মিলিশিয়া গড়ে তুলতে হবে যা হবে ঘাঁটি এলাকার ভিত্তি। গণযুদ্ধের তিনটি স্তর রয়েছেঃ রণনৈতিক আত্মরক্ষা, রণনৈতিক ভারসাম্য ও রণনৈতিক আক্রমণ। যুদ্ধ প্রথমে হবে প্রধানতঃ গেরিলা যুদ্ধ। তারপর তা চলমান যুদ্ধ ও অবস্থান যুদ্ধে বিকশিত হবে। বিপবী যুদ্ধের বিকাশের প্রক্রিয়ায় গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে হবে। ঘাঁটি এলাকা হচ্ছে রণনৈতিক এলাকা যা শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে, যেখানে জনগণের গণকমিটিসমূহের আকারে গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বারংবার হাত বদল হওয়ার মধ্য দিয়েই এই ঘাঁটিগুলো বিকশিত হয়। পেরুর গনযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যুদ্ধের প্রক্রিয়া হচ্ছে পুনপ্রতিষ্ঠা ও পাল্টা পুনপ্রতিষ্ঠার লড়াই।

আমাদের যুদ্ধ গণযুদ্ধ। জনগণের ওপর নির্ভর করে জনগণকে সমাবেশিত করেই কেবল এ যুদ্ধ চালানো যায়। বাহিনী গড়ে তুলতে হবে ঘাঁশমূল থেকে। এর অর্থ হচ্ছে প্রথমেই নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে গণযুদ্ধের ইতিহাসের কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে এর সমর্থক জনগণ রয়েছে। এছাড়া কৃষক জনগণ সর্বদাই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। কৃষি বিপবী কর্মসূচি প্রয়োগ করে দেশের যে কোন স্থানে জনজোয়ার সৃষ্টি করা সম্ভব। সুতরাং এই শত সহস্র সক্রিয় জনগণই হচ্ছেন বাহিনীর ভিত্তি। তাদের ভেতর থেকে দ্রুতই এখানে মিলিশিয়া চরিত্রের বাহিনী ইউনিট গড়ে ওঠে। এর থেকে ধারাবাহিকভাবে অনিয়মিত স্কোয়াড ও নিয়মিত গেরিলা ইউনিট গড়তে হবে যা পাটুন, কোম্পানী, ব্যাটেলিয়ন...ইত্যাদিতে বিকশিত করতে হবে। পার্টি বন্দুককে কমান্ড করবে এই নীতি এই বাহিনী মেনে চলবে।

তাকে মনোযোগ দেবার আটটি ধারা মেনে চলতে হবেঃ

১. ভদ্রভাবে কথা বলুন।
২. ন্যায্যমূল্যে কেনাবেচা করুন।
৩. ধার করা প্রতিটি জিনিস ফেরত দিন।
৪. কোন জিনিস নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ করুন।
৫. লোককে মারবেননা, গাল দেবেননা।
৬. ফসল নষ্ট করবেননা।
৭. নারীদের সাথে অশোভন ব্যবহার করবেন না।
৮. বন্দী সৈন্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেননা।

বাহিনী গঠনের দুই ধরনের ত্রুটিঃ

১. প্রথমেই একটি নিয়মিত ইউনিট গড়া কৃত্রিমভাবে--যা জনগনের মধ্য থেকে গড়ে ওঠেনা এবং এটা মূল শ্রেণীর জনগণের কর্মসূচি এগিয়ে নেয়না। এই প্রবণতায় শ্রেণীসংগ্রামের প্রক্রিয়ায় বাহিনী গড়ে ওঠে না। এটা ভ্রাম্যমান গেরিলাবাদী বাহিনী।

২. অনিয়মিত গেরিলা বাহিনীতে আটকে যাওয়া--জনগণের মধ্য থেকে অনিয়মিত বাহিনী ইউনিট গড়ে ওঠলেও এর থেকে নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়না। এই বাহিনীও ভ্রাম্যমান ভাড়াটে বাহিনীতে পরিণত হয়।

কর্মসূচি

মূল নীতিসমূহ

১। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে পথনির্দেশক মতবাদ হিসেবে আঁকড়ে ধরা। বিশেষত মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপবের নীতিকে আঁকড়ে ধরা যা হচ্ছে বিরাট শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে বিরাট দুই লাইনের সংগ্রাম চালানো, আর বিরাট দুই লাইনের সংগ্রামের মধ্যে ব্যাপক মতাদর্শিক পুনর্গঠন।

২। দ্বন্দ্ব হচেছ জাগতিক বস্তু জগতের অবিশ্রান্ত রূপান্তরের একমাত্র মৌলিক নিয়ম , জনগন ইতিহাস সৃষ্টি করেন এবং "বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত";

৩। শ্রেণী সংগ্রাম, সর্বহারা একনায়কত্ব ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ

৪। দুই লাইনের সংগ্রামকে মাওবাদী পার্টিরড়নীতিগত ভিত্তি হিসেবে আঁকড়ে ধরা। একে পার্টির বিকাশের আভ্যন্তরীন চালিকা শক্তি হিসেবে আঁকড়ে ধরা ।ড়

৫। একটি নতুন ধরনের পার্টি গড়ে তোলা অর্থাৎ বিপরীতের ঐক্যভিত্তিক অর্থাৎ দুই লাইনের সংগ্রাম ভিত্তিক পার্টি গড়ে তোলা যা গনযুদ্ধ সুচনা ও বিকাশে সক্ষম, আমাদের মতো দেশে কৃষক, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ ও নেতৃত্ব দিতে সক্ষম, বেআইনী কেন্দ্রের সাথে আইনী কাজের বিরাট জাল সৃষ্টি করতে সক্ষম।

৬। একটি নতুন ধরনের বাহিনী গড়ে তোলা যা জনগনের কাছে বোঝা হবেনা বরং উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকবে।

৭। পার্টি, বাহিনী ও ফ্রন্ট এই তিন যাদুকরী অস্ত্রকে আঁকড়ে ধরা এবং এই তিনটিকে পরস্পর সংযুক্ত ভাবে গড়ে তোলা।

৮। গণযুদ্ধে অস্ত্র নয়, জনগণই হচ্ছে নির্ধারক, এই নীতিকে ঊর্ধে তুলে ধরা।

৯। জনগনের রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা গণক্ষমতা হচ্ছে আমাদের মতাদর্শে মৌলিক।

১০। জনগণের ওপর নির্ভর করা, প্রধানত শ্রমিক, ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের ওপর নির্ভর করা। অর্থাৎ মূল শ্রেণী সমূহের ওপর নির্ভর করা।

১১। জনগণের স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগকে ঊর্ধে তুলে ধরা।

গণতান্ত্রিক বিপবের সাধারণ কর্মসূচী

১। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক বুনিয়াদী মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক,কৃষক, মধ্যবিত্ত,ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার মাধ্যমে

সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ উচ্ছেদ করে নয়াগনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তথা নয়াগনতান্ত্রিক বিপব সাধন করা, অব্যাহতভাবে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের পথে এগিয়ে চলা, এই লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে সাংস্কৃতিক বিপবসমূহের জন্ম দেয়া ।ড়

২ । বাংলাদেশ প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন, যা হচেছ আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে শোষকদের একনায়কত্ব; এর সশস্ত্র বহিনী সমূহের ধ্বংসসাধন, সকল অত্যাচারী শক্তিসমূহ ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহের ধ্বংস করা ।

৩ । প্রধানত মার্কিনসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী ও প্রধানত ভারতীয় সম্প্রসারণবাদসহ সকল আধিপত্যবাদী শোষণ ও নিপীড়ণ উৎখাত করা, সাধারণভাবে তাদের একচেটিয়া কোম্পানীসমূহ, ব্যাংক এবং বিদেশী ঋণসমেত তাদের সকল রূপের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ।

৪ । ব্যক্তি ও রাষ্ট্র নিয়োন্ত্রিত আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ধ্বংস করা, তাদের সম্পত্তি, দ্রব্যসামগ্রি ও অর্থনৈতিক অধিকার বাজেয়াপ্ত করা, সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুক্ত সবকিছু বাজেয়াপ্ত করা ।

৫ । আধা-সামন্তবাদী সম্পত্তি আর গ্রামে-শহরে এর উপর টিকে থাকা সবকিছুর বিলোপ সাধন ।

৬ । গ্রামে ও শহরে জাতীয় বুর্জোয়াদের অথবা মাঝারি বুর্জোয়াদের সম্পত্তি ও অধিকারকে সম্মান করা ।

৭ । কৃষি বিপবকে নয়াগনতান্ত্রিক বিপবের অক্ষ হিসেবে আঁকড়ে ধরা । তাই ভূমি বিপব এবং ‘যে জমি চাষ করে তার হাতে জমি’ নীতিকে আঁকড়ে ধরা । এই নীতির ভিত্তিতে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর জমি বাজেয়াপ্ত করে ভুমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বন্টন । মাঝারি কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করা আর ধনী কৃষকদের শর্তসাপেক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা ।

৮ । গনযুদ্ধকে কেন্দ্রীয় কর্তব্য হিসেবে আঁকড়ে ধরা । বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথ হিসেবে গ্রাম ভিত্তিক দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ আকঁড়ে ধরা ।

৯ । সকল প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে মোকাবেলা করে বাংলাদেশী জাতির গঠণ সম্পূর্ণ করা, সংখ্যালঘু সকল জাতিসত্তাসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদান এবং আদিবাসী জনজাতিসমুহের সকল অধিকার রক্ষার মাধ্যমে দেশকে সত্যিকার ভাবে ঐক্যবদ্ধ করা ।

১০ । প্রতিটি দেশের বিপব বিশ্ব সর্বহারা বিপবের অংশ । প্রতিটি দেশের সর্বহারা শ্রেণী বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ, সুতরাংড়আন্তর্জাতিকতাবাদকে দৃঢ়ভাবে উর্ধে তুলে ধরা । বিশ্ব সর্বহারার ঐক্যের লক্ষ্যে বিপবী আন্তর্জাতিকতাবাদী উদ্যোগ সমর্থন করা, তাতে অংশ গ্রহন করা ও তাকে এগিয়ে নেওয়া যাতে বিশ্ব বিপব সাধন করা যায় এবং একটি নতুন ধরনের কমিউনিস্ট আর্ন্তজাতিক গড়ে তোলা যায় ।

১১ । শ্রমিক শ্রেণী ও জনগন রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা, অধিকার, লাভ ও বিজয়সমূহ অর্জন করেছে তা রক্ষা করা ; সেসবের স্বীকৃতি প্রদান এবং “জনগনের অধিকারের ঘোষণা”র মাধ্যমে এর বৈধ প্রয়োগ । ধর্মমতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান কিন্তু এর ব্যাপক অর্থে, বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস করার মতের স্বাধীনতা । জনগণের স্বার্থের ক্ষতি করে এমন সকল প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করা, বিশেষত যেকোন প্রকার অদেয় মজুরী অথবা ব্যক্তিগত বোঝা অথবা জনগনের ওপর চেপে বসা নিরংকুশ করসমূহের বিরুদ্ধে ।

১২ । জমি, সম্পত্তি, কাজ, পরিবার ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে নরনারীদের জন্য সত্যিকার সাম্য; তরুনদের জন্য অধিকতর ভাল ভবিষ্যত---শিক্ষা, কাজ ও বিনোদনের নিশ্চয়তা ; মা ও শিশুদের জন্য নিরাপত্তা; বয়স্কদের প্রতি সম্মান ও সহযোগিতা ।

১৩ । এক নয়া সংস্কৃতির বিকাশ যা ব্যাপক জনগণের সেবা করে আর সর্বহারা শ্রেনীর মতার্দশ দ্বারা পরিচালিত ।

১৪ । আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণী, নিপীড়িত জাতিসমূহ ও দুনিয়ার জনগণের সংগ্রামসমূকে সমর্থন করা, একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা, রাশিয়া ও ইউরোপ, জাপানসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা ; ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা; সৌদি আরব, চীনসহ সকল আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা । আন্তর্জাতিক সকল রূপের সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা !

কেন্দ্রীয় কমিটি
কমিউনিস্ট পার্টি
মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী
বাংলাদেশ
কর্তৃক ১মে ২০১২ প্রকাশিত ।